জাতীয় জীবনে
মূল্যবোধের অবক্ষয়

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

জাতীয় জীবনে
মূল্যবোধের অবক্ষয়

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬

প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪৩০ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইংরেজী

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ:
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN-070
ISBN-984-31-1426-0

মূল্য (অফসেট কাগজ) : ১০০ টাকা মাত্র।
ইউএসডলার : ৩ ডলার মাত্র।

Jatio Jibona Mullaboder Abbakhy, Writen by Muhammed Rezaul Karim, and Published by Professor's Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price offset paper : Tk.100.00 only.US$ 3.00 Only.

উৎসর্গ—

যার অসিলায় আমি এই পৃথিবীর আলো দেখেছি
যিনি আমাকে হাঁটতে-চলতে শিখিয়েছেন
আমাকে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন
আর যিনি এখন আমার কাছে কেবলই এক প্রেরণাময় স্মৃতি–
সেই পরমপ্রিয় মরহুম আব্বাজানকে...

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। অবশেষে প্রকাশিত হলো আমার প্রথম বই “জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়”। এ জন্য মহান রাব্বুল আ'লামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমি চলার পথে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক অসঙ্গতি ও অনিয়ম দেখে ব্যথাহত হয়েছি। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। এই বইটি মূলত সেইসব লেখারই একটা কালেকশন।

আমি মাসিক নির্ঝর ও ওই সকল দৈনিকের কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমার লেখাগুলো ছেপেছেন। আমি প্রবন্ধগুলোতে দেখাতে চেষ্টা করেছি জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং এর অভাবে একটি জাতির কী অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। সকল জাতিকেই তার নিজস্ব গতিতে চলতে হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে পতন অনিবার্য।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহ্ স্যারকে যিনি অসুস্থতার মধ্যে থেকেও আমার পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলিয়ে দিয়েছেন। মারুফ ও সুমন গাজীকে ধন্যবাদ জানাতেই হয় কারণ তারাই তো আমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলোকে সংগ্রহ করে এই বই প্রকাশে সহযোগিতা করেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাহিত্যিক জুবায়ের হুসাইনকে যে রাত জেগে আমার লেখাগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পাদনা করেছেন। বইটির প্রকাশক এ এম আমিনুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই যিনি অনেক কষ্ট করে বইটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন। তাঁর সাথে সমন্বয় সাধন করেছেন প্রিয় ভাই মহিউদ্দিন মধু। প্রুফ দেখা, কম্পিউটারে সেটা সংশোধন করা প্রভৃতিতে সহযোগিতা করেছেন একরামুল আমিন মামুন, আব্দুর রাজ্জাক, নুরুন্নবী রায়হান, আশরাফুল ইসলাম, আশেক মাহমুদ শান্ত, মুহাম্মদ ইসরাফিল, নাসির আহমেদ, শামীম এবং আরও যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন–সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। এদের কষ্ট সত্যিই অনস্বীকার্য।

প্রবন্ধগুলো লেখার সময় অসংখ্য বই, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। ভালো হতো সেইসব উৎস ও লেখকের নাম তথ্যপুঞ্জিতে উল্লেখ করতে পারলে। কিন্তু সেগুলো সংগ্রহে না থাকায় সেটা করা সম্ভব হলো না। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

প্রথম প্রকাশ হওয়ায় কিছুটা মুদ্রণ-ত্রুটিও থেকে যাওয়া অমূলক নয়। বিষয়গুলো সহৃদয় পাঠককুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। বইটি পড়ে পাঠক হয়তো খুব বেশি উপকৃত হবেন না। কিন্তু এটা প্রকাশ করতে পেরে আমি নিজে অত্যন্ত আনন্দিত। বইটি পড়ে কেউ যদি সামান্যতমও উপকৃত হন, তবে সেটাই হবে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা।

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

অভিমত

“জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়” লেখকের প্রথম বই। অসুস্থতার কারণে পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ পড়তে পারিনি। বইটিতে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা) জ্ঞানার্জন ও জীবন উপলব্ধির উপর যে উদ্ধৃতিগুলি রয়েছে, তা সকল শ্রেণীর পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবে।

তিনি যে এই মহৎ কাজে হাত দিতে সাহস দেখিয়েছেন, সেজন্য তাকে মোবারকবাদ জানাই। তার এই লেখাগুলো পড়ে বিশেষ করে যুবসমাজ কিছুটা হলেও উপকৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আশা করব লেখক তার লেখা অব্যাহত রাখবেন এবং যুবসমাজকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে থাকবেন। আল্লাহ লেখকের হায়াত বৃদ্ধি করুন। বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করছি।

১১/৯/০৯

(মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহ্)
সাবেক সচিব ও সম্পাদক

সূচীপত্র

- অসুস্থ ছাত্র রাজনীতির কবলে বাংলাদেশ ৭
- সাওমের তাৎপর্য ১২
- ইরাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন : স্তম্ভিত বিশ্ববিবেক ১৭
- শিক্ষার মৌলতত্ত্ব ২৮
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তরালে ভারতে মুসলিম নিধন ৪২
- কাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতির স্বরূপ ও আজকের বাংলাদেশ ৫১
- সফল নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি ৫৯
- বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক মুহাম্মদ (সা) ৭৭
- জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় ৮৮
- ছাত্রসংগঠনের ৩৩ বছর—
  সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ঐতিহাসিক অবদান ১১৪

অসুস্থ ছাত্র রাজনীতির কবলে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি এক সময়কার অহংকার, আজকের লজ্জা। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বের নন্দিত ছাত্ররাজনীতি আজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিন্দিত ও কলুষিত। ছাত্রনেতার নাম শুনলেই আজ মানুষ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অথচ এক সময় যারা ছাত্ররাজনীতি করত তাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখত। তখনকার ছাত্রনেতারা ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন, ভদ্র, নম্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা নিয়মিত ক্লাস করতেন। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্ররাই ছাত্রনেতা হতেন। ভালো রেজাল্টধারী, মেধাবী ছাত্ররাই ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন। তাদের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি দেখে মুগ্ধ হতো সবাই। তাদের শাণিত বক্তব্য দেশ গড়ার কাজে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করত। দেশ ও জাতির সংকট মুহূর্তে এই আদর্শ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে আপামর ছাত্র-জনতা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকত। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররা। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু আজকের ছাত্ররাজনীতি সকলের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। এখন চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, ছিনতাই, সিট দখল, হল দখল ও অস্ত্রবাজীর আর এক নাম ছাত্ররাজনীতি। ছাত্রনেতা মানেই ভয়ঙ্কর কোন সন্ত্রাসী। টাকার জন্য হেন কাজ নেই তারা করতে পারে না। অছাত্র ও আদু ভাই মার্কা নেতৃত্বে পরিচালিত আজকের ছাত্ররাজনীতি আমাদের ভবিষ্যতকে করে তুলেছে মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু কেন? কেন এই অবস্থা? মাত্র অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ছাত্ররাজনীতির দশা এ রকম হল কেন? দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যতকে রক্ষার জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে পেতে হবে সমাধান।

বর্তমান ছাত্ররাজনীতির এই দশার পেছনে প্রথম যে কারণটি সক্রিয় তা হলো জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার লোভ। জাতীয় নেতাদের চরিত্রের অধঃপতন সমান্তরালে ছাত্রনেতাদেরও চারিত্রিক স্খলন ঘটছে। জাতীয় নেতারা ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে ছাত্রদের। ছাত্রদের

হাতে অস্ত্র ও টাকা তুলে দিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলা করার জন্য মাঠে নামানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা হয়ে পড়ছে মেধাশূন্য ও পেশাদার সন্ত্রাসী। মাদকদ্রব্যে আসক্ত করিয়ে লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে তাদের। এভাবে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে মারামারি, রক্তপাত ও হানাহানি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিরোধীদল সব সময় তার ছাত্রসংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিতে চায়। চায় সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করতে। আর অন্যদিকে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন সরকারি প্রভাব খাটিয়ে ক্যাম্পাসে অবৈধ টাকা উপার্জন ও শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ফলে ক্যাম্পাসগুলোতে চালু হয় এক অসুস্থ রাজনৈতিক কালচার। সরকারি ও বিরোধী উভয় ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনো অশান্ত হয়, কখনো বন্ধ হয়, পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, সেশনজট বাড়তে থাকে। মেধাবী ছাত্ররা হতাশ হয়ে পরিণত হয় ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারে। লেখাপড়া করতে এসে বিশ্ববিদ্যলয় থেকে বেরিয়ে যায় সন্ত্রাসী হয়ে।

দেশের প্রতি, দেশের জনগণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছাত্রদের প্রতি আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কোন রকম সহানুভূতি নেই। আমাদের জাতীয় নেতারা তাদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য দেশের বাইরে পাঠান যেখানে সন্ত্রাস বা সেশন জট নেই। তাই কার সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা নিয়ে নেতাদের কোন মাথাব্যথা থাকে না। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৩ জন রাষ্ট্রপতি (সাবেকসহ), ৩৫ জন মন্ত্রী, ৭১ জন সংসদ সদস্যের সন্তান দেশের বাইরে লেখাপড়া করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিজের সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে নেতারা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত। বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন জাতীয় নেতাদের অনুসারী ছাত্রনামধারী কিছু সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। আর এই তথাকথিত ছাত্রনেতারা ছাত্ররাজনীতির অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে ছাত্ররাজনীতিকেই সবার কাছে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে।

বর্তমান ছাত্ররাজনীতির এই হালের পেছনে আর একটি কারণ বিদ্যমান। তা হলো, বিদেশী ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশ যাতে কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না

পারে, বাংলাদেশের ছাত্ররা যাতে মেধাবী হিসেবে গড়ে উঠে দেশের কল্যাণ করতে না পারে তার জন্য বিদেশী কিছু ষড়যন্ত্রও আমাদের দেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকলে এদেশের মেধাবীরা দেশের বাইরে লেখাপড়া করতে যাবে। আর মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে সেই মেধাকে তারা নাগরিক সুবিধা দিয়ে নিজের দেশে রেখে দেবে। একদিকে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য ও অশান্ত রাখাও হলো অন্যদিকে নিজের দেশে মেধাবী ছাত্রকে আমদানি করাও হলো।

জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষের কাঁচামাল হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহারের প্রবণতা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করছে। বাড়িয়ে তুলছে সেশনজট, ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়ছে কলুষিত, মেধাশূন্য, সন্ত্রাস ও পেশীশক্তি নির্ভর। বিশেষ করে ভিন্নমত ও ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতার অভাব ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে হানাহানি, হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। আর বিদেশী চক্রান্তের জাল তো আছেই। কথায় কথায় ছাত্রধর্মঘটের আহবানও সেই অসুস্থ রাজনৈতিক কালচারের বহিঃপ্রকাশ। দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যার রাহুগ্রাস থেকে জনগণ মুক্ত হতে না হতেই ছাত্রলীগ সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহবান করলো। কেন? কারণ হিসেবে বলা হলো ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্ত করতে হবে। বেশ। ইন্টারপোল এলো, এফবিআই এলো। কিন্তু ছাত্রলীগের ধর্মঘট প্রত্যাহার হলো না। এক পর্যায়ে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক সবাই যখন ক্যাম্পাসগুলো চালু করে দিল তখন ছাত্রলীগ নিজের সম্মান বাঁচাতে তড়িঘড়ি করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ একটি ঘটনা নিয়ে তারা আবার সারা দেশে ধর্মঘট ডাকলেও এবারও তাদের ধর্মঘট ফ্লপ করেছে।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত হোক, দোষীদের বিচার হোক তা সকলেই চায়। কিন্তু এ ঘটনাকে পুঁজি করে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া নিশ্চয়ই কোন গণতান্ত্রিক আচরণ হতে পারে না। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার পর আমেরিকাতে কোন হরতাল বা ধর্মঘট হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। ইরাক হামলার বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে ১৫ আগস্ট'০২ পাঁচ লক্ষ

লোকের সমাবেশ হয়েছিল। লণ্ডনে ৭ লক্ষ লোক ইরাকে হামলার জন্য ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। কিন্তু তারা ভাঙচুর, নৈরাজ্য সৃষ্টি, হরতাল বা ধর্মঘট করেনি। কারণ তাদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে। তারা দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। আর আমাদের নেতারা কথায় কথায় হরতাল ও ছাত্রধর্মঘট ডেকে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে কার্পণ্য করে না। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তিনি সামান্য কারণে তার লেজুড় সংগঠন ছাত্রলীগকে দিয়ে বার বার ছাত্রধর্মঘট আহবান করিয়ে দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজী ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসগুলোতে সাধারণ ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেই তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই বর্তমানে ছাত্রলীগের ডাকা ধর্মঘট আর ক্যাম্পাসগুলোতে পালিত হয় না। শেখ হাসিনা বিষয়টি উপলব্ধি করেন কিনা জানি না। তবে দেশের জনগণ এটুকু উপলব্ধি করে যে শেখ হাসিনার দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। কারণ তার সন্তান আমেরিকায় লেখাপড়া করে। এজন্য তিনি যখন খুশি ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে চাপিয়ে দেন অযৌক্তিক ধর্মঘট। ক্যাম্পাসগুলোকে অচল করে দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণের কুটিল পথ ধরেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এ অবস্থা থেকে কি কোন মুক্তি নেই? এভাবেই কি চলবে বাংলাদেশ? অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি, সন্ত্রাস আর সেশনজটে জর্জরিত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কি কোন উপায় নেই?

প্লেটো বলেছেন, 'Man is by born a political being' অর্থাৎ মানুষ জন্মগতভাবেই একটি রাজনৈতিক সত্তা। জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও কথাটি সত্যি। তাই মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত কেউ না কেউ ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। সিদ্ধান্ত তার কাছ থেকেই আসে। শারীরিক শক্তি, মানসিক যোগ্যতা, মানবিক দক্ষতা সব কিছুর বিবেচনায় কেউ না কেউ প্রমিন্যান্ট হয়ে ওঠেন। ক্রমেই এই প্রমিন্যান্ট ব্যক্তিই হয়ে ওঠেন ডমিন্যান্ট। মেধায়, যোগ্যতায়, সেবায় ডমিন্যান্ট হলেই একজনকে সবাই মেনে নেয়। তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত হয়। নিরাপত্তা, সেবা ও সাহায্য আশা করে। এই নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে জনগণের কল্যাণ-অকল্যাণ। এই নেতৃত্ব যদি সৎ

হয় তাহলে তার নেতৃত্বে সমাজে শান্তি আসে আর নেতৃত্ব অসৎ হলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের জাতীয় ও ছাত্রনেতৃত্ব উভয়েরই অবস্থান সততা ও দেশপ্রেম থেকে অনেক দূরে। তাই সমাজ ও ছাত্ররাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা, অসততা, দুর্নীতি পরিহার করে আমাদের জাতীয় নেতাদের দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসলেই একমাত্র ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা সম্ভব। মেধাহীন, সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতিকে দেশের জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী কেউই পছন্দ করে না। মেধাভিত্তিক আদর্শিক ছাত্ররাজনীতি আজ তাই সময়ের দাবি। সকল দলাদলি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে আজকের ছাত্রদের মাঝে মেধাবী, সৎ ও আদর্শনির্ভর ছাত্ররাজনীতি উপহার দিতে। লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি নয় বরং ছাত্রসংগঠনগুলোকে স্বাধীন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের মেধাবিকাশ এবং গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছাত্ররাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা থাকতে পারে। জাতীয়ভাবে তারা কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারে। কিন্তু সরাসরি জাতীয় রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ছাত্রসংগঠনগুলোকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। আর ছাত্রসমাজকেও সন্ত্রাস ও মেধাহীন ছাত্রনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে মেধাবী, চরিত্রবান ও আদর্শিক নেতৃত্বের ধারা তৈরি করতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে, মানুষ গড়ার আঙ্গিনা থেকে যাতে সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা যায় এজন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অক্টোবর, ২০০৪

সাওমের তাৎপর্য

আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন সবার উপরে। এর অনেকগুলো কারণ- আল্লাহ সর্বদা বিরাজমান, তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন, তিনি সবকিছু শুনছেন, আল্লাহকে না দেখে এমনি এক শক্তিশালী বিশ্বাসের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাসের উপর একাগ্রতা ও গভীরতা যার যত বেশি তিনি ততটাই আল্লাহর হুকুম পালন ও নিজেকে প্রস্তুত রাখেন।

বান্দার এই বিশ্বাসের গভীরতা যত বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই ইমারতের উপর ততটাই তার ইবাদত বন্দেগীসহ যাবতীয় কর্মতৎপরতা পরিচালিত। আর বন্দেগীর এই Classification-ই হচ্ছে মুমিন, মুত্তাকী ও মুহসিন। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করেছেন তাকওয়ার বা খোদাভীতির ভিত্তিতে। আল্লাহ বলেন– 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দালাহে আত্‌কাকুম'- তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, আল্লাহর নিকট যিনি সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী।' আর তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়। যে আল্লাহকে যত বেশি ভয় করবে তার মর্যাদা তত উপরে, তিনিই মুত্তাকী।

আল্লাহকে ভয় করার পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় সিয়ামের মধ্য দিয়ে যা অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে প্রকাশ পায় না। অন্য ইবাদত (যেমন নামাজ) মানুষকে দেখানোর ইচ্ছা থেকে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তাদের জন্য ধ্বংস যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে।' হজের মধ্যে ঠিক তেমনি অহংকার থাকতে পারে। বর্তমানে আমাদের সমাজে কারো কারো নিকট হজের সংখ্যা গণনা একটা বাহবা পাওয়ার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সিয়াম বা রোযা এমন একটি ইবাদত যা মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে ভয় করার সর্বোত্তম একটি প্রমাণ। রোযা মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়ে রাখে। রোযা মানুষকে দেখানো যায় না। তাই আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (বাকারা : ১৮৩)

রমজান আরবি নবম মাস। 'রোযা' ফারসি শব্দ যার অর্থ উপবাস। আরবি রযম থেকে রোযা; অর্থ পোড়ানো বা দহন করা। রোযার মাধ্যমে মানুষ তার পাপ প্রবণতাকে দহন করে নির্মল হয়। সিয়াম বহুবচন, এক বচনে সাওম অর্থাৎ

স্থগিত রাখা, বিরত রাখা, চুপ থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি। সুতরাং সুবহে সাদেক অর্থাৎ প্রভাতের আলোর সাদা রেখা প্রকাশের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সম্ভোগ হতে বিরত থাকাকে সিয়াম বলা হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে রোযা এখনও অন্ধের হাতি ধরার মতই রয়ে গেছে। অন্ধ যেমন হাতির কান ধরার পর হাতি কেমন জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয় হাতি কুলার মত, শরীরে হাত দেয়ার পর জিজ্ঞাসা করলে সে বলে হাতি পাহাড়ের মত; ঠিক তেমনি রমজানের আসল উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে এর ফজিলতগুলোকে আলাদা আলাদা করে চিন্তা, উপলব্ধি ও পালন করলে প্রকৃত অর্থে সফল হওয়া যাবে না। যেমন সিয়াম সাধনা, সওগাত, দান খয়রাত, রমজানের একটি নফল অন্য সময়ের ফরজ, একটি ফরজ অন্য সময়ের সত্তরটি ফরজের সমান। রোযাদারেরর মুখের গন্ধ মিশ্‌ক অম্বরের মত। রাসূল (সা) বলেন, 'মানুষের প্রত্যেকটি কাজের ফল আল্লাহর দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়। একটি নেক কাজের ফল দশগুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে থাকে।' আল্লাহ বলেন- 'রোযাকে এর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কারণ রোযা খাস করে কেবল আমার জন্য রাখে। আর আমিই তার প্রতিদান দিব।' রোযাদারের আনন্দ দু'টি- প্রথম ইফতার করার সময়। দ্বিতীয় আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ।

উপরোক্ত শুভ সংবাদ শুধু তাদের জন্য যারা পাশবিকতার দমন এবং নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর। কিন্তু মানুষের নৈতিক সত্তার বিকাশ সাধনে সৃষ্টির আদি থেকে তিনটি বিষয় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী, তা হলো উদরপূর্তি বা ভোগবিলাস, নারী সম্ভোগ ও অতি আরামপ্রিয় উচ্চাভিলাষী মনোবৃত্তি। আর যদি লাগামহীনভাবে এগুলো চরিতার্থ করার মানসিকতা গড়ে উঠে তাহলে মানব সমাজে মহাবিপর্যয় দেখা দেয়। আজকে পাশ্চাত্য ইউরোপ, আমেরিকা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণতার গণ্ডি থেকে মানুষ বের হয়ে মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়। আর মানবতার আর্তচিৎকারে কম্পিত হয় পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। অথচ আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে বাস উপযোগী করে সমাজ সভ্যতা গড়ার নিমিত্তে মানুষ তৈরি করেছেন। আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তি দমনের জন্যই রোযা প্রবর্তন করা হয়েছে। রমযানের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালীউলাহ দেহলভী বলেন- যেহেতু পাশবিক বাসনার প্রাবল্য ফেরেশতাসুলভ অর্জনের পথে অন্তরায়, তাই এই

উপকরণগুলোকে পরাভূত করে পাশবিক শক্তিকে আয়ত্বাধীন করাই হচ্ছে রোযার আসল তাৎপর্য।

এটি প্রমাণিত সত্য যে, সাওমের মাধ্যমেই শুধু উপরোক্ত কল্যাণ হাসিল করা সম্ভব বলেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণ ওহী লাভের পূর্বে এবং বিভিন্ন সময় রোযা পালন করেছেন। যেমন হযরত মূসা (আ) তুর পাহাড়ে আল্লাহর নিকট হতে তাওরাত পাওয়ার পূর্বে চলিশদিন পানাহার ত্যাগ করে মানবজীবনের বহু উর্ধ্বে আরোহন করেছেন। হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল পাওয়ার পূর্বে চলিশদিন অনুরূপ সাধনা করেছেন। 'কামা কুতিবা আলালাজিনা মিন ক্বাবলিকুম' এর মানে মানব ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এমন কোন শরীয়ত বা মিলাত নাই যাদের ওপর রোযার বুনিয়াদী কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়নি। হযরত আদম আঃ হতে হযরত নূহ (আ) পর্যন্ত চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা ফরজ ছিল। তাকে 'আইয়্যামে বীজ' রোযা বলা হত। ইহুদিদের উপর প্রতি শনিবার বছরের মধ্যে মহররমের ১০ তারিখে এবং অন্যান্য সময় রোযা ফরজ ছিল। খ্রিষ্টানদের উপর মুসলমানদের মত রোযা ফরজ ছিল। তাছাড়া ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুগণও বিশেষ উপবাস পালন করত। প্রাচীন সোমাইটদের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল এবং রোমক, ব্যাবিলনীয়, আসীরীয়, জৈন, জয়থস্ত্রীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যেও রোযার প্রচলন ছিল। এখানে উলেখ্য যে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে চিন্তার বিভিন্নতা নিয়ে তারা রোযা পালন করত। কেউ কেউ এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নীতিও অবলম্বন করে। যেমন ইহুদিরা সপ্তাহব্যাপী উপবাস থাকে, খ্রিষ্টানরা সূর্যাস্তের অনেক পর আহার গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তাই বলা হয়েছে- 'খায়রুল উমুরে আওসাতুহা'– মধ্যম পন্থাই উত্তম। কেবলমাত্র মুসলমানরাই সাহরী ও ইফতারের নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করে চলছে।

তাই বলে শুধু উপবাসই মুসলমানদের টার্গেট নয়। এটাও এ থেকে পরিষ্কার। যেমন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, 'মানলাম ইয়াদিউ কাওলাজযুর ওয়াল আ'মালাবিহী লাইসা লিলাহি হাজাতুনফি আ-ই-ইয়াদ যা তায়ামাহু ওয়া শরাবাহু- অর্থাৎ রোযা রেখে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা ছেড়ে না দেয় তবে শুধু খাদ্য পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। । রমজানের রোযার উদ্দেশ্য হলো ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা, অন্যায়, অবিচার, ত্যাগ করে মায়া, মমতা, আত্মত্যাগ, ন্যায়নীতি, সংযত, ইনসাফ, সমবেদনা, মাখলুকের সেবা, একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করার যোগ্য করে গড়ে তোলা। এর মধ্য দিয়ে পয়দা হয় ভয় ও আমানতদারী। ফলে সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি, সুশৃঙ্খলতা ও উন্নতির ধারা সূচিত হয়। আর মহান আল্লাহতায়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে তাঁর

প্রতিনিধি বানিয়েছেন সেই প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরিগ্রহ হয়। তাই যে উমর (রা) রাসূল (সা)কে হত্যার জন্য উদ্যত হল সে আবার রাসূলের হেফাজতকারী হলো।

যারা ভক্ষক ছিল তারা হলো রক্ষক, যারা লুণ্ঠন, ছিনতাই, রাহাজানি করত তারা হলো সর্বোত্তম আমানতদার। এভাবে একটি বৈপবিক পরিবর্তন যে জিনিসটি মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছিল সেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহতায়ালা এ মাসে অবতীর্ণ করে এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন, 'শাহরুর রমাদানালাজি উনযিলা ফি হিল কুরআন, হুদালিন নাস ও বাইয়্যেনাতে মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান।' অর্থাৎ রমজান মাস, যে মাসে কুরআনুল কারীমকে নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য নির্দেশাবলী এবং উজ্জ্বল হিদায়েত ও সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্যকারী। রমজানের আসল মর্যাদা হলো এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবতার হেদায়েত ও মুক্তির জন্য। এ মাসের কদরের রাত্রিতে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাকে 'আলফে শাহার' (হাজার মাসের চাইতে উত্তম) বলে অভিহিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কদরের রাত্রিতে ইবাদত করবে তার পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (আল হাদিস)

রমযানের রোজা যেমন পূর্ববতীদের উপর ফরজ ছিল এবং মহানগ্রন্থ আল কুরআন এ মাসে নাজিল হয়, তেমনি আল্লাহতায়ালা সকল আসমানী কিতাব এ মাসেই অবতীর্ণ করেছেন- এই মাসের ১লা বা ৩য় তারিখে ইব্রাহিম (আ) এর সহীফাসমূহ প্রেরিত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি যবুর শরীফ এই মাসের ১২ অথবা ১৮ তারিখে নাজিল হয়েছে। হযরত মূসা (আ) এর তাওরাত শরীফ এই মাসের ৬ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) এর প্রতি ইঞ্জিল কিতাব এই মাসের ১২ কিংবা ১৩ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে। মানব জাতির হেদায়েতের সকল কিতাবই এই মাসে আল্লাহতায়ালা অবতীর্ণ করলেন। আর মানুষকে দিলেন খেলাফতের দায়িত্ব। এই কুরআনের আইন বাস্তবায়নের একজন সৈনিক হিসেবে আল্লাহতায়ালা ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করার জন্য রোযা ফরজ করেছেন। সাথে সাথে সত্য এবং মিথ্যার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তথা কুরআন যে ফুরকান এর প্রমাণও এই মাসের ১৭ রমজানের ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। আল্লাহতায়ালা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাই বলেছেন, 'হুয়ালাজি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা আদ্দীনিল হাক্ক লিইয়ুজ হুরাহু আলাদ্দিনী কুলিহি ওলাও কারিহাল মুশরিকুন।' তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে 'কুতিবা আলাইকুমুচছিয়াম'কে আমরা যেমন ফরজ হিসেবে পালন করছি তেমনি এর পরিশুদ্ধ শক্তি, মন, চিন্তা সম্বলিত প্রয়াসের মাধ্যম হবে আল্লাহর অনুরূপ আরেকটি আয়াত 'কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল' এর বাস্তবায়ন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ঠিক তেমনি 'আকিমুসসালাত'- এর ফরজিয়াতকে আমরা যেমন উপলব্ধি করছি, তার সাথে 'আকিমুদ্দীন' এর ফরজিয়াতকে উপলব্ধি করতে না পারলে প্রকৃত কোন ফলাফল বান্দাহ যেমন এই দুনিয়ার জীবনে লাভ করতে পারবে না তেমনি পরকালিন জীবনেও পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আল্লাহ বলেন-'আফাতুমিনুনা বেবাযিল কিতাব অতাকফুরুনা বি বায়ায' অর্থাৎ কুরআনের এক অংশকে মানবে অপর অংশকে মানবে না এতে কল্যাণের পরিবর্তে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

তাই রোযা মুসলমানদের চিন্তায় ও কর্মে তথা লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রত্যেকটি কাজ সার্বক্ষণিক আল্লাহর উপস্থিতির পয়দা করে। জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ আল্লাহর আইন মোতাবিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম শিক্ষাই গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি বাকি এগারটি মাস আল্লাহর আইন অনুসারে চলার প্রশিক্ষণ আর তা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। এছাড়া রমজানের রোযার বাহ্যিকও অনেক কল্যাণ রয়েছে।

মানবদেহ একটি যন্ত্রের মত। রোযার মাধ্যমে পাকস্থলীর বিশ্রাম হয় ও কর্মদক্ষতা বাড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে এই মাসে উপবাসের কারণে মানুষ অনেক বড় রোগ থেকে মুক্তি পায়। একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনে সিনা তাঁর রোগীদের তিন সপ্তাহব্যাপী উপবাস পালনের নির্দেশ দিতেন। তিনি সিয়ামকে সিফিলিস এবং বসন্ত রোগের বিশেষ ঔষধ মনে করতেন।

ফরাসি বিপবের সময় মিসরের হাসপাতালগুলিতে সিয়াম পালন-ই ছিল সিফিলিস রোগের অমোঘ ঔষধ। ড. জুয়েলস এমডি বলেন- যখন একবেলা খাদ্য বন্ধ থাকে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটাকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে। ড. ডিউই বলেন- জীর্ণ এবং ক্লিষ্ট রোগীর পাকস্থলী হতে খাদ্যদ্রব্য সরালে রোগী উপবাস থাকছে না, সত্যিকারভাবে রোগটি উপবাস থাকছে। এই রমজানে ধনীরা উপবাস থেকে ক্ষুধার্তের কষ্টের জ্বালা উপলব্ধি করেছে, তাই তারা হবে গরিবের প্রতি রহমদিল। সকল কিছু ভুলে মানবতার জয়গানে মহীরূহ হবে এই বিশ্বময়। দূর হবে আমাদের মধ্যে হানাহানি, সঙ্ঘাত, হিংসা, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ।

আসুন, রমজানের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রকে আল-কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত করি।

সেপ্টেম্বর, ২০০৯

ইরাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন : স্তম্ভিত বিশ্векবিবেক

'Fundamental Rights, Basic Human Rights, Birth Rights of Man'- প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ মানবাধিকার। বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে উত্তপ্ত ও প্রাণবন্ত আলোচনা এখন সর্বত্রই। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অর্ধ শতাব্দী হতে চলেছে এর বয়স। কিন্তু মানবিকতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যার জন্ম তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক, মনুষ্যত্বহীনতা, অমানবিকতা ও পাশবিকতার গ্লানি এবং বিকৃত চেতনা নিয়ে এই অবৈধ সন্তানটি মানবসমাজে আজ জীবিত। তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবিকতার লেবাস পরে মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যেটি মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করছে সেটি হচ্ছে মানবাধিকার। তাই ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রুশো আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও সে তার সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। এর প্রায় দুই শত বছর পর ১৯৪৭ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস সমসাময়িককালের মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা আজ দেখা দিয়েছে।"

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে দৃশ্যপটে চোখ বুলালে মনে হয় আমাদের জীবন অনেক সুখময় হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখি বোমার আঘাতে অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার দৃশ্য, যখন শুনি খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মানুষ মরার খবর, যখন পড়ি কারাগারে মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্যদের লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক নির্যাতনে নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুর খবর, তখন পৃথিবীতে মানবিকতা বলে কিছু আছে বলে মন মানতে রাজী হয় না।

আজকের দিনে মানবাধিকার যতটা ব্যাপকভাবে আলোচনার আসর জুড়ে আছে, তার চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পর রুশো ও ভলটেয়ারের গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই 'গণতন্ত্র-ব্যক্তি স্বাধীনতা-লিবার্টি' শব্দসমূহ বিশ্বে এক বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বটে; কিন্তু আজকের পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রগতির দাবিদার জড়বাদী দর্শনের অনুসারীরা তাদের দন্ত-নখর বিস্তার করে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ধ্বংস সাধনে লিপ্ত রয়েছে।

টমা পেইন মানবাধিকার আর স্বাধীনতার স্বঘোষিত ধ্বজাধারীদের অন্ধ চোখগুলোকে একটি তিক্ত সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, "স্বাধীনতা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এই পলাতককে ধরো এবং মানবতার জন্য সময়মত একটি আশ্রয়স্থল নির্মাণ কর। হাজারো বেদনাপূর্ণ কথা, হাজারো প্রচার ও ঘোষণাপত্রের পরও স্বাধীনতা এখনো রূপকথার পাখি। আমেরিকাই হোক অথবা রাশিয়া, পর্তুগাল, এঙ্গোলা, ইংল্যান্ড, রোডেশিয়া বা বোস্টনই হোক কোথাও তার নাম-নিশানাও নেই।"

আজ বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য। মানবতার এ দলনপীড়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে মানবাধিকারের তথাকথিত স্বঘোষিত মোড়লেরা।

ইরাক আক্রমণের সময় প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন, ইরাকিদের মুক্তজীবনের স্বাদ দিতে তারা এই যুদ্ধে গিয়েছেন। কিন্তু ইরাক আক্রমণের বর্ষপূর্তির দিনে এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে ঘৃণাভরা বিক্ষোভে অব্যাহতভাবে ধ্বনিত হয়েছে- 'নো ব্লাড ফর অয়েল', 'স্টপ জেনোসাইড', 'সেভ দ্যা হিউমিনিটি', 'সেভ ইরাক', 'সেভ মুসলিম'। এমনকি ব্রিটেনের ঐতিহাসিক বিগ বেন ঘড়িতে লিখে দেয়া হয়েছে "সত্যের সময় সমাগত"।

যারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সুশাসন, নারীর অধিকার ও বিশ্বশান্তির প্রবক্তা তাদের ব্যাপারে তো এমনটি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু না, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের দখলদার বাহিনী বাগদাদে আবু গারিব কারাগারে যে পৈশাচিক বর্বর আচরণ ও নির্যাতন চালিয়েছে তা বিশ্ববাসীকে হতবাক ও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। বন্দীদেরকে ধর্ষণ, নারীদের উলঙ্গ করে ছবি ধারণ, বন্দীদের বিবস্ত্র করে মানপিরামিড তৈরি, সামরিক কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গলায় রশি বেঁধে টানা, গায়ে মল মাখিয়ে শিকল পরিয়ে হাঁটানো, মৃতদেহের উপর মহিলা সৈন্যদের আনন্দ উল্লাস- এসব কোন সভ্যতার পর্যায়ভূক্ত?

কিন্তু যা জানা যায় তা যদি এমন নিষ্ঠুর ও লজ্জাজনক হয় তাহলে এর ভেতরে কত লোমহর্ষক ঘটনা যে রয়েছে তা কে জানে! এ জন্য শিল্পী তার সঙ্গীতে গেয়ে ওঠেন-

"প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে
জীবন খাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে।"

এসব তথ্য হয়তো কেউ জানতো না, ইরাকের আকাশে বাতাসে মিশে যেত সেই আহাজারি, আর্তচিৎকার, অত্যাচার- নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা, ঘৃণিত ও

কলঙ্কিত ঘটনা। মানুষ কত জঘন্য হতে পারে তা অপরূপভাবে চিত্রিত করেছে স্বয়ং পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়াগুলো। মানবতার বুলি আর সভ্যতার গালভরা ডাক-হাঁকের অন্তরালে আসল চিত্র তারা তুলে ধরেছে। সভ্যতার চিরন্তন আলোর প্রদীপ নিভে গেছে চিরতরে- দস্যুতা, পশুত্ব আর বর্বরতা সেখানে প্রভুত্ব গড়েছে মানবতা আর সততার বুকে লাথি মেরে। পেশীশক্তি সেখানে কায়েম করেছে আইনের শাসন দণ্ড। রাষ্ট্রীয় চিরাচরিত নিয়ম, সভ্যতার মানদণ্ড, মানবিকতা, মহানুভবতা, সুবিচার ইত্যাদি সভ্যতার শাশ্বত অধিকার যেন "ওয়ার অন টেরর"-এর নামে সর্বক্ষেত্রে সদাসর্বদা হচ্ছে পদদলিত ও অবাঞ্ছিত। বিশ্বের সকল জাতির মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কঠিন ধিক্কার সত্ত্বেও 'একলা চলো নীতি'-এর আওতায় আমেরিকা তার মানবতার ঘৃণ্য আইন একের পর এক চালু করে চলছে তথাকথিত 'ওয়ার অন টেরোরিজম'-এর নামে।

অন্যদিকে ইরাক দখলকারী মার্কিনবাহিনীর বন্দীশিবিরে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের লোমহর্ষক চিত্র খোদ আমেরিকান জনগণকেই শিহরিত করেছে। এই ভয়াবহ ও অকল্পনীয় নিপীড়নের দৃশ্য দেখে শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর পাশাপাশি চমকে উঠেছে ব্রিটিশ জনগণও। বন্দীশিবিরে কোন আমেরিকান সৈনিক তার গোপন ক্যামেরায় ধারণ করেন এইসব নির্যাতনের চিত্র। তারপর রীলেটি পাঠিয়ে দেন স্বদেশে কোন বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি ছবিগুলো প্রিন্ট করে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেন। ব্রিটেনের বহুল প্রচারিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা ডেইলি মিরর ৩০ এপ্রিল ইরাকি বন্দীদের ওপর ব্রিটিশ সৈন্যদের লোমহর্ষক নির্যাতনের ছবি প্রকাশ করেছে। এই সাথে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত দু'জন ব্রিটিশ সেনার জবানবন্দী প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ২৯ এপ্রিল মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিবিএ বাগদাদের উপকণ্ঠে আবুগারিব কারাগারে ইরাকি বন্দীদের উপর মার্কিন সেনাদের বর্বরতা ও যৌন নিপীড়নের ছবি প্রকাশ করে। এ অবস্থায় বন্দীদের উপর দখলদার মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের নৃশংস নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্বসম্প্রদায় শঙ্কিত। মুসলিম দেশগুলোসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ক্ষোভ ও নিন্দায় ফেটে পড়েছে। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ স্বয়ং ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও হতবাক। ব্রিটিশ সেনাপ্রধান জেনারেল স্যার মাইকেল জ্যাকসন ব্রিটিশ বাহিনীর বর্বরতা ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ইরাকি বন্দীদের ওপর এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনা সত্যি হলে এর সঙ্গে জড়িতদের রাণীর ইউনিফর্ম পরার কোন অধিকার থাকবে না।

জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের কারাগারে আটক বন্দীদের ওপর বর্বর নির্যাতনের ঘটনাকে 'জঘন্য' বলে অভিহিত করেছেন। সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠার পর বুশ দু'টি আরব টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেন। আল-হুরা টেলিভিশনে ১০ মিনিট সাক্ষাৎকারে বুশ বলেন, ইরাকের মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে আমি এ আচরণকে জঘন্য মনে করি। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের সাজা দেয়া হবে। অন্যদিকে ইরাকে সামরিক কারাগারের নির্যাতনের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছেন, ইরাকি বন্দীদের ওপর আমেরিকান সৈন্যদের নির্যাতনের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান ও ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করবে। বলাবাহুল্য, বন্দী নির্যাতনের এই ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক থেকে আমেরিকা অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। কোন মুসলিম দেশেই আমেরিকাকে শত্রু ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাবে না। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেখানে মানুষ আমেরিকাকে দখলদার ও বুশকে শয়তান হিসেবে দেখছে।

সম্প্রতি বিশ্বের নানা প্রান্তে যেভাবে বুশ ও ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তাতে এটাই প্রমাণিত হয় শান্তিকামী জনগণ এই যুদ্ধের তীব্র বিরোধী। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং, ফিলিপাইনে হাজার হাজার লোক ইরাক আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষোভ করেছেন। জাপানে অন্ততঃ ৩০ হাজার বিক্ষোভকারী তাদের স্লোগানে ইরাক থেকে মার্কিন ও জাপানি সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। ফিলিপাইনে বিক্ষোভকারীরা মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ের চেষ্টা করে। হংকংয়েও একই ঘটনা ঘটে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডের কিম্ভূত আকৃতির বিশাল এক কুশপুত্তলিকা নিয়ে বিক্ষোভ করেন। তারা ইরাক থেকে দুই হাজার অস্ট্রেলিয়ানসেনা ফেরত আনার দাবি জানান।

আমেরিকাতেও হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাজপথে নেমে এসে বুশের ইরাক-নীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন, দাবি করেছেন অগ্নিগর্ভ ইরাক থেকে মার্কিনসৈন্য প্রত্যাহারের। তীব্র বিক্ষোভের এই ঢেউ শুরু হয় সানফ্রানসিসকোতেও। সেখানে শত শত বিক্ষোভকারী প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। তাদের স্লোগান ছিল 'যুদ্ধ নয়, স্বাস্থ্যসেবা চাই,' 'ইরাকে কর্পোরেট আগ্রাসন বন্ধ করো'। বার্তা সংস্থাগুলা জানায় আমেরিকা জুড়ে দু'দিনে ইরাক আগ্রাসনবিরোধী ২৫০টি মিছিল বের হয়।

বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে লন্ডনে, ইতালির রাজধানী রোমে, স্পেনের মাদ্রিদে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইরাক থেকে দখলদার বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। শুরু থেকেই সাধারণ মার্কিনীরা কখনোই বুশের ইরাক-নীতিকে এক বাক্যে সমর্থন করেনি। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূলের অজুহাতে প্রেসিডেন্ট বুশ ২০ মার্চ ইরাকে হামলা চালিয়েছিলেন। তখন আমেরিকা ন্যাশনাল আনেনবার্গ ইলেকশন সার্ভের এক জরিপে দেখা যায়, বুশের বর্তমান ইরাক-নীতিতে মার্কিনীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পক্ষে ৪৭ ভাগ, ৪৯ ভাগ বিরুদ্ধে। আমেরিকার নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল মনোনীত প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সিনেটর জন কেরি বলেছেন, 'বুশের ইরাক-নীতির ফল হয়েছে ব্যাপক প্রাণ ও অর্থক্ষয় এবং এতো কিছুর পরেও ইরাক সঙ্কট এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার আপাত কোন সমাধান চোখে পড়ছে না।' খোদ মার্কিন প্রভাবশালী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি বিবিসির সাংবাদিক জেরেমি প্যাক্সম্যানের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছেন, "নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের মতো বিশেষ আদালতে যদি জর্জ বুশের বিচার করা হতো, তবে তাকে অবশ্যই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। একই ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত জিমি কার্টারসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার সকল প্রেসিডেন্টের।"

ওই এক বছরে ইরাক পরিস্থিতি খোদ আমেরিকা ও ইরাককে কোন পথে নিয়ে গেছে তার পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান যে, এ এক বছরে ইরাকে শান্তি তো আসেইনি বরং আমেরিকার বর্তমান প্রশাসন ভবিষ্যতকে আরো জটিল করে তুলেছে। ওই এক বছরে ইরাকে যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে প্রায় ১০ হাজার ইরাকি প্রাণ হারিয়েছে। প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার ইরাকি নাগরিক দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী রয়েছে। অনেকের হদিসও পাওয়া যাচ্ছে না। যে শক্তি বন্দী সাদ্দামের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তোড়জোড় করছে খোদ তাদের বিরুদ্ধেই 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে, তাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ আনে তা হাস্যকর হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। অপরদিকে ওই এক বছরে ইরাকে আমেরিকার প্রায় ৬০০ সৈন্য নিহত হয়েছে। ইরাকিদের হাতে প্রায় প্রতিদিন মার্কিনসৈন্য প্রাণ হারাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭ হাজার মার্কিন সামরিকসদস্য গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে। প্রায়

৫০০ সৈন্য বিনা অনুমতিতে ছুটি ভোগ করে পলাতক রয়েছে। ৬০ জন মহিলা সেনাসদস্য সহকর্মী পুরুষ সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছে। অভিযুক্তরা এখন সামরিক আদালতে বিচারাধীন। সম্প্রতি এক সৈন্যকে তো ধারাবাহিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

আমেরিকার করদাতাদের প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার খরচ হয়েছে এবং প্রতিমাসে আনুমানিক ১০০ ডলার খরচ অব্যাহত থাকবে। আমেরিকার ঐ বছরের বাজেটকে সে দেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ঘাটতি বাজেট বলে চিহ্নিত হয়েছে।

আবুগারিব কারাগারে যুদ্ধবন্দীদের ওপর নির্যাতনের বহু আলোকচিত্র এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। যৌনবিকৃত, ধর্ষণকামী আমেরিকানসৈন্যরা অভিনব সব পন্থায় ইরাকি যুদ্ধবন্দীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের কাছে বিপুল পরিমাণ পর্নো ছবি দেখা যায়। তাদের এগুলো দেয়া হয় বা তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে আগত মার্কিনসৈন্যদের কাছে এসব পর্নো ছবি দেখা যেত, তারা বিনোদনের জন্য এগুলি কাছে রাখত। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পর্নো ছবি তৈরির অন্যতম বড় ঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দেশে যৌনরোগ বিস্তারে মার্কিনসৈন্যরা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাদের মধ্যে বহু সমকামীও আছে। ইরাক যুদ্ধবন্দীদের ওপর নির্যাতন চালানো যৌনবিকৃত মার্কিনসৈন্যরা তাদের বিনোদনের একটি অংশ হিসেবে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মহিলা সৈনিক লিন্ডির সামনে মার্কিনসৈন্যরা কেবল ইরাকী যুদ্ধবন্দীদেরই উলঙ্গ করেনি, লিন্ডির বয়ফ্রেন্ডসহ অন্য মার্কিনসৈন্যরাও তার সম্মুখে নগ্নদেহে উল্লাস করেছে। প্রকাশিত একটি চিত্রে দেখা যায়, আবুগারিব কারাগারে এক শ্মশ্রূমণ্ডিত উলঙ্গ ইরাকি যুদ্ধবন্দীকে লিন্ডি নামের উক্ত মহিলা গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার আইনে যেন বিশ্বের কারো কোন কিছু বলার নেই। দেশটি যেন সকল আইনের উর্ধ্বে। কালাকানুনের তৈরি সকল নির্যাতনের একজিকিউশন শুরু হয় এসব ডিটেইনীদের উপর। সভ্য আমেরিকানদের মিথ্যে হিউম্যান রাইটস-এর পর্দা ছিড়ে বেরিয়ে আসে লোমহর্ষক নানা কাহিনী। পাওয়া যায় তাদের ক্যাম্পগুলোতে ৬ বছরের ছেলে থেকে ৮৯ বছরের বৃদ্ধকেও ঘৃণ্য উপায়ে নির্যাতন করার খবর।

মনে পড়েনি তাদের হিউম্যান রাইটস-এর ঐতিহাসিক চার্টার-ফ্রিডম অব স্পিচ, ফ্রিডম অব রিলিজিয়াস একটিভিটিজ এবং ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এর বুলিগুলো। বিশ্ববিবেক ও মানবতাকে উপহাস আর হতবাক করেছে এসব রূঢ় আচরণের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার লীলাভূমিতে।

বিশ্বের নাম্বার ওয়ান সুপার পাওয়ার আমেরিকার আসল চেহারা বিশ্ববিবেকের নিকট আজও রয়েছে অজানা। আজও রয়েছে রাজনীতির ধূম্রজালে। নামকাওয়াস্তের এই ইনকোয়ারী দিয়ে আমেরিকান সরকার বিশ্ববিবেকের নিকট নিজের মানবাধিকারের অন্ধকার ইতিহাসকে করে রাখে রহস্যাবৃত। জেনেভা কনভেনশনের নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আমেরিকা ক্যাম্প এক্স-রে ডেটেইনীদের বেশ কিছু অমানবিক ছবি প্রকাশ করলে শুরু হয় বিশ্বজুড়ে ধিক্কার আর আলোড়ন। লোমহর্ষক আর ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতনের কারণে সম্প্রতি জেনেভা কনভেনশনে আমেরিকার এই বর্বর দ্বীপটির নাম দেয়া হয়েছে 'লিগ্যাল ব্ল্যাকহোল'।

এমনি একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কর্মরত একজন অফিসার তার মন্তব্যে বলেছেন, আমি যখন রাতে ঘুমাতে যাই, আমার ঘুম আসে না, কানে কেন যেন সকল সময় শুনতে পাই ঐসব লোকগুলোর করুণ আর্তনাদ আর আহাজারী। মনে হচ্ছে যে তারা আমার পাশে স্ক্রিমিং করছে করুণভাবে। আমি কোনক্রমেই এসব আর্তনাদ থেকে বাঁচতে পারি না।

পেছনের দিকে চোখ ফেরালেই দেখা য়ায়, ৯/১১ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতি চলছে যেন এক ভয়াবহ অজানা দুর্বিসহ গলিপথে। যে পথ মৌলিক মূল্যবোধ, বাকস্বাধীনতা, মানবীয়মর্যাদা, ধর্মীয়স্বাধীনতা, সকলের জন্য সমরনীতি ও সৌর্য-বীর্য ছেড়ে চলছে পরিকল্পিতভাবে এক ভিন্ন ডাইরেকশনে।

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রসের কাছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক গোয়েন্দা অফিসাররা বলেছেন, ইরাকে শতকরা ৭০ থেকে ৯০ ভাগ লোক এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। যাদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ নিরীহ নাগরিক। এগুলো সব ভুল করে ঘটানো হচ্ছে।

১৮৭৮-৮০ সালে দ্বিতীয় আফগানযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের বাড়াবাড়ি, সাম্প্রতিক যুদ্ধে আফগানিস্তানে দখলদার বাহিনীর গণহত্যা, অতীতে আফ্রিকার বিভিন্ন

উপনিবেশে ব্রিটিশসৈন্যদের নির্যাতন, ভিয়েতনামে বেসামরিক লোকদের ওপর মার্কিনসৈন্যদের বর্বরতা এবং ইরাকে বন্দীশিবিরে মানবতা ও মানবাধিকারবিরোধী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নৃশংসতা- সবই একসূত্রে গাঁথা। ইঙ্গ-মার্কিনসৈন্যদের কার্যকলাপ তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। মুক্তিকামী বিশ্বের ইতিহাস কোনদিনই এদের ক্ষমা করবে না।

মাত্র কিছুদিন আগে ঘটে গেল মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ। সেখানে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সার্ববাহিনী মুসলিম গ্রামে ঢুকে নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালক-শিশুদেরকে জড়ো করে মুসলিম রমণীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নিজ সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের সামনে ধর্ষণ করে। যতক্ষণ না মুসলিম নারীদের গর্ভধারণের লক্ষণ দেখা দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর সার্বীয় কুকুরদের লালসা মিটানোর পালা চলে। সার্ববাহিনী ৫ থেকে ৪০ বছরের ৪০ হাজার মুসলিম নারীকে ১৬টি বন্দী শিবিরে আটকে রাখে। অতঃপর সার্বিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে প্রতিদিন বাসযোগে এসে তাদের ওপর চালাতে থাকে গণধর্ষণ। নিউজ উইকের ভাষ্যানুযায়ী কোন কোন জায়গায় মুসলিম তরুণীদের লাইনের পর লাইন করে শুইয়ে গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে জবেহ করে হত্যা করা হয়। তিনজন মুসলিম তরুণীর হাতে শিকল বেধে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে গলায় একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে লেখা ছিল- 'সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত'। একটানা তিনদিন গণধর্ষণের পর চতুর্থদিনে তাদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। অবুঝ শিশুদের টগবগে গরম পানিতে নিক্ষেপ করে নিমিষে সিদ্ধ হওয়া শিশুদের গোশত পিতামাতাকে খেতে বাধ্য করা হয়। বসনীয় মুসলিম জনতাকে নিধনে নিত্যনতুন কৌশলে ভয়াবহ অপরাধ সংঘঠিত হলেও জাতিসংঘ বা তথাকথিত মানবতাবাদী পশ্চিমাগোষ্ঠী সার্বীয় নরঘাতকদের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি। উল্টো মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নিরস্ত্র জনতাকে তোপের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে তাদের নীলনকশানুযায়ী। একই কায়দায় নির্মম নিপীড়ন, খুন, জীঘাংসা চালানো হচ্ছে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তীনি জনতার বিরুদ্ধে। আজাদী পাগল চেচেন জনতার শত বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শত শত রুশ বোমারু বিমান, ট্যাংক আর মারণাস্ত্র দিয়ে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিন অঞ্চল ৫০ বছর ধরে ভারতীয় মিলিটারীদের ভারী

বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। মুসলিম রমণীদের স্বামী-পিতা-সন্তানদের সামনে ধর্ষণের পর তাদের স্তন কেটে ফুটবল খেলা হচ্ছে।

ইরাকে অমানবিক মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে কয়েক লক্ষ শিশু খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত্যুবরণ করেছে আরো ৩ লক্ষ ইরাকি জনতা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে ১৯৪৫ সালে নিষেধাজ্ঞার কারণে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৯ অক্টোবর ইউনিসেফের এক রিপোর্টে বলা হয়, প্রতি মাসে ৪ লক্ষ ৫ হাজারেরও বেশি ৫ বছরের কম বয়সী শিশু ক্ষুধা ও রোগে মারা যাচ্ছে। ৯৬ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ৬ গুণ বেড়ে গেছে এবং দেশের অধিকাংশ জনগণ ক্ষুধা মেটানোর জন্য যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে না।

অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মদিনা রিপাবলিকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান Charter of Madina-এ জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলিম সমভিব্যহারে গঠিত মদিনার বহু ধর্মভিত্তিক সমাজে প্রণীত উক্ত সনদে উল্লেখ ছিল, "মদিনায় ইহুদি, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই একদেশবাসী, সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদি, নাসারা, পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউই কারো ওপর হস্তক্ষেপ করবে না।" সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এমন প্রোজ্জ্বল উপমা পৃথিবীর বুকে এটিই ছিল প্রথম। বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কেমব্রীজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর খুবা বলেন, এই সংবিধান দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের সমান নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তাসহ মদিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা হয়।

ইসলাম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো স্বীকৃতি দেয়। তাই বলা যায়, ইসলামী মানবাধিকার হল সূচনা ও সমন্বিত উৎস, কারণ ইসলামী অধিকারের আবির্ভাব হয়েছে ৬ষ্ঠ ও

৭ম শতকে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক অধিকারের আবির্ভাব বুর্জোয়া চেতনার যুগে- ত্রয়োদশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এবং সমাজতন্ত্রের আর্বিভাব বিংশ শতাব্দীতে। সুতরাং ইসলাম মানবাধিকারবিরোধী তো নয়ই বরং মানবাধিকারের মাইলফলক ও প্রবক্তা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রে মানবাধিকার হলো বস্তুকেন্দ্রিক, বস্তুগত অর্জনই এখানে লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামী মানবাধিকারের লক্ষ্য ধর্মীয়, নৈতিক আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুগত সম্পদ স্বাধীনতা। ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তুকেন্দ্রিক সম্পদ স্বাধীনতা ও সমতা হলো অবস্তুগত লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় মাত্র। মূলত ইসলামের মানবাধিকারের ধারণা ব্যাপকতর ও ব্যাপক তাৎপর্যবহ। ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার মানব-সমাজের জন্য এক অনুপম দার্শনিক উৎস। ইসলাম উপস্থাপিত মানবাধিকারের অনবদ্য নীতিমালাগুলো পড়ে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ এমনকি ইসলামের চরম দুশমনও অভিভূত হবেন, হবেন শ্রদ্ধাবনত- এটি দ্বিধাহীন চিত্তেই বলা যায়।

যারা এখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছেন, আর ইসলামকে মানবতাবিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী ও অসহিষ্ণু বলছেন। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে তারা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানের মানবাধিকার আইন পাশ করান। অন্যদিকে সেই ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, "বংশ, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সব মানুষ সমান।" শুধু ঘোষণা করা নয়, তাঁর এবং খিলাফতে রাশেদার আমল এই ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। অহংকারে অন্ধ ওরিয়েন্টালিস্টরা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন বিধিবদ্ধ করেন, অথচ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের খাবার প্রদান করেন। মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বন্ধ হয়। এই বন্ধ করার আইন পাশ করতে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়। অথচ সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে ইসলামের নবী (সা) দাসপ্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসরা মুক্ত হতে থাকে। ইসলামে বিধান হচ্ছে- 'একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, পরা ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে'।

দেশে-বিদেশে এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে শত শত সংগঠন গড়ে উঠেছে। কার্যত এসব সংগঠন ও সংস্থা আড়ালে মানবতাবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। অধিকার আদায়ের নামে তারাই চাতুরতার সাথে দেশে বিদেশে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবাধিকার খর্ব করার ষড়যন্ত্র করছে। সম্প্রতি তারা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান তৈরি করলেও ইসলাম সাড়ে তেরশ' বছর আগেই মানবাধিকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছে। খোলাফায়ে রাশেদীন মাত্র ৩০ বছরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন মানব ইতিহাসে তা চিরদিন স্মরণীয় এবং বিশ্ববাসীর কাছে মডেল হয়ে থাকবে। আর এজন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে ইসলামের অনবদ্য ভূমিকায় বিমুগ্ধ Bosworth Smith তার Mohammad and Mohamadanism গ্রন্থে উচ্ছসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন: "It recognized individual and public liberty, secured the person and property of the subjects and postered the growth of all civic virtues. It communicated all the privileges of the conquering class to those of the conquered who conformed of its religion, and all the protection of citizenship to those who did not. It put an end to old customs that were of immoral and criminal character. It abolished the inhuman custom of buring the infant daughters alive, and took effective measures for the suppression of the slave-traffic." আজ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের যে চরম লঙ্ঘন ও অবমাননা চলছে তা সভ্য মানুষের ও মানবতার গালে একটি চপেটাঘাত। মজলুম মানবতার করুণ আহাজারি, পৃথিবীর ক্রন্দনধ্বনি আজ বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। আর এর হাত থেকে রক্ষা পেতে শাশ্বত বিধান আল ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধতা আজ সময়ের অনিবার্য দাবি।

জুন, ২০০৪

শিক্ষার মৌলতত্ত্ব

ইংরেজি 'Education' প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে, ইংরেজিতে এর ভাবার্থ হচ্ছে 'to lead out' বা 'to draw out'। শিক্ষার আরবি প্রতিশব্দ ইলম বা জ্ঞান এবং বিশেষক্ষেত্রে হিকমত বা কৌশল হিসেবে এর প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের 'বিকাশ সাধন' বা তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার 'বহিঃপ্রকাশ' ও 'বাস্তবায়ন' বোঝায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইংরেজি 'Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার ভাবার্থ হলো 'to bring up' অথবা 'to train' অথবা 'to mould.' অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা'। (ঘোষ ও রায় : ১৯৮৭ : ১) আবার ল্যাটিন শব্দ 'Educo'-কে কেউ কেউ ইংরেজি 'Education' শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে 'E' অর্থ 'out' এবং 'duco' অর্থ 'to lead' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে কোন কিছু 'পরিচালিত করা' বা 'বের করা' বা 'প্রতিভাত করা'কে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে। (চৌধুরী : ১৯৮৩ : ৩)

শিক্ষা এমন একটি ধারবিহীন অস্ত্র যা দিয়ে চিন্তা জগতের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। সৃষ্টির সূচনা হতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। পৃথিবীর আদি পিতা আদম (আ) আল্লাহপাকের প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই ফেরেশতাকুলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। উপস্থিত ফেরেশতাকুল জ্ঞানরাজ্যে আদম (আ) অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করে তাকে শিক্ষক হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হন এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর নিকট চরম সম্মান প্রদর্শণ করেন। একমাত্র শিক্ষার কারণেই আদম (আ) সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তার ফলশ্রুতিতে আজ মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত ও স্বীকৃত। শিক্ষা মূল্যায়নের মানদণ্ড, টিকে থাকা না থাকার মাপকাঠি।

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বেই আরবজাহানের কথা চিন্তা করলে মানুষ আতকে ওঠে। ইমলাম তমসাচ্ছন্ন আরবকে সভ্য দুনিয়ার কাছে তুলে ধরে এবং আরববাসীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির অনেক উদাহরণ সভ্য দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করে। আর তা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র তদানীন্তনকালের প্রচলিত শিক্ষা, যে শিক্ষা একমাত্র অলঙ্ঘনীয় শিক্ষা, আদর্শ

শিক্ষা ও নির্ভুল শিক্ষা মাধ্যম। তখনই মানুষ সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে কবি গোলাম মোস্তফা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'তে উল্লেখ করেছেন '... যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ বহুযুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। যে বাণীর আরম্ভই হইল : পাঠ কর অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান। (গোলাম মোস্তফা : ২০০:৭৯) বাংলাদেশের অন্যতম দার্শনিক শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাইদুর রহমান তাঁর 'An Introduction to Islamic Culture and Philosophy' গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে বলেছেন, 'Though himself unlettered (ummi) Muhammad (SM) was the first to realise the necessity of literacy.'

অধ্যাপক রেমন্টের মতে, 'Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to the physical, social and spiritual environment' (Raymont : 1963:17)

শিক্ষা সম্পর্কে ঋকবেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হলো এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'। (ঘোষ ও রায় : ১৯৮৭ : ১) ভারতীয় দর্শনে শিক্ষাকে আত্ম-পরিতৃপ্তি লাভের উপায় হিসেবেও দেখানো হয়েছে। দার্শনিক কণাদ এ অর্থেই শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। আবার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাকে মানুষের চরিত্র গঠন এবং পৃথিবী তথা সমাজ উপযোগী করার প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। চাণক্য বা কৌটিল্য শিক্ষাকে দেশসেবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ ও জাতির প্রতি যথার্থ ভালোবাসা প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর শঙ্করাচার্যের মতে 'শিক্ষা হলো আত্মোপলব্ধির উপায়মাত্র'।

প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তাবিদগণও শিক্ষা বলতে প্রধানত মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর নৈতিক ও নান্দনিক জীবন বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হলো শিক্ষা নানাগুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের 'ভদ্রলোক'

তৈরি করবে, 'যে' হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। (খাতুন: ১৯৯৯ : ১৪) তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে শিক্ষাকে পেশা ও জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন করে তুলেন। প্রাচীন চীনের অপর দার্শনিক লাঁচাঁ (কনফুসিয়াসের সমসাময়িক) প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ছকবাঁধা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বদলে প্রকৃতির উদার পরিবেশে শিক্ষালাভের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি বিধানের কথা বলেছেন। প্রাচীন চীনের শিক্ষায় কনফুসিয়াসের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে লাঁচাঁর প্রকৃতিবাদী ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছিল।

সক্রেটিস ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শনেও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অ্যারিস্টটলীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি তথা নাগরিককে তার প্রজ্ঞা ও মেধা অনুশীলনের সাহায্যে বিবেকবান ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলা, যার জীবন হবে একান্তভাবে বাস্তব চিন্তাসম্পৃক্ত। অ্যারিস্টটল শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও অভ্যাস উভয়েরই সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া অত্যাবশ্যক বলে মন্তব্য করেছেন। (করিম : ১৯৮৩: ৩৪৫) অর্থাৎ প্লেটো ও অ্যারিস্টটল ভিন্নমুখী দর্শনের প্রবক্তা হলেও শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের ওপর উভয়ই গুরুত্বারোপ করেছেন। (Pleasure and pain in the right moment)

সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা (Education is the creation of sound mind in a sound body)- অ্যারিস্টটল। শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি (Education is the capacity to feel). রোমান দার্শনিকরা গ্রিকদের তুলনায় ছিলেন বেশি বাস্তববাদী। এ জন্য প্রাচীন রোমান শিক্ষাব্যবস্থা ফলিতবিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্প ইত্যাদির উপস্থিতি রয়েছে। আমেরিকার সমাজ দার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁর ধারণা মতে, Education is not a preparation of life, rather it is living (Dewey : 1916:24)

জাতিসংঘও শিক্ষার ধারণায় মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলির বিকাশ ও মানব উন্নয়নের উপায় হিসেবে গণ্য করে বলেছে, 'Education is the means for bringing about desired changes in behaviours, values and life style, and for promoting public support for the continuing and fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course... Education, in short is humanity's best hope and most effective means to the quest to achieve sustainable human development' (উদ্ধৃতি: লতিফ: ২০০৫:৮-৯) সাথে সাথে ইউনেস্কো জীবনযাপনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা ও উপলব্ধি অর্জনের নির্দেশনা হিসেবেও শিক্ষাকে গণ্য করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষ্য হচ্ছে, 'Education is Organized and sustained instruction designed to communicate a combination of Knowledge, skills and understanding valuable for all the activities of life.' (UNESCO: 2002)

জোহান হেনরিক-এর মতে 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ' (Education is natural, Harmonious and progressive development of man's innate power)- পেস্তালৎসি। জন ফেডারিক হারবার্ট বলেন- 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন' (Education is the development of moral character)

পার্সি নান এর ভাষায়-'শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝায় যার সাহায্যে সে নিজের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে স্বকীয় অবদান রাখতে পারে' (Education is the complete development of the individuality of child, so that he can make original contribution to human life according to the best of capacity).

জ্ঞানার্জনমূলক লক্ষ্য

শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুণাবলীর অনুশীলন মাত্র। বস্তু জগতের দ্রব্যসামগ্রী ও তার গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত । কেউবা মনে করেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থ শিক্ষা। কিন্তু যারা সমাজের সাধারণ লোক তারা শিক্ষা বলতে বিদ্যার্জনকেই বুঝে থাকেন। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। শিক্ষাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করেননা কেন, কোনটাকেই যেমন একেবারে বাদ দেওয়া যায় না বা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি আবার সেগুলোকে শিক্ষার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলে গ্রহণও করা যায় না; যেমন অ, আ, বা, তা, সা এগুলোকে আপাত

দৃষ্টিতে শিক্ষা বলে ধারনা করা হয় বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে সত্যিকারের শিক্ষা বলা যায় না। বরং সেগুলো শিক্ষার উপকরণ মাত্র। আবার কোন কোন জিনিসের নাম বা তার গুণাবলী জানাও পূর্ণ শিক্ষা নয়। কারণ তাকে ঠিকমত কাজে প্রয়োগ করার কৌশল জানা, তাকে প্রকাশ করা ও ভবিষ্যতে বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সাফল্য ও নিশ্চয়তা দান করার নামই শিক্ষা।

যেমন সেদিনের দিগম্বর যাযাবর বন্য মানুষ আজ পোষাকে-পরিচ্ছদে আর বিভিন্ন সাজ-সজ্জার মাধ্যমে হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুন্দর নর-নারী। সেদিনের গুহাবাসী আজ যার আলোকে চন্দ্রাভিযান, আর গ্রহ থেকে গ্রহতে ছুটাছুটি করছে, যার মাধ্যমে সেদিন যারা পাথরে পাথরে আঘাত করে আগুন জ্বালাত, আজ তারা এগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চাকচিক্যময় দালানকোঠার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছে। আজ সেসব উপাদান দ্বারা নিজেদের ইচ্ছামত আরাম-আয়েশের সাথে বসবাসের জন্য মনোরম দালানকোঠা আর আকাশচুম্বী অট্টালিকা বানাচ্ছে।

সেদিন তারা চন্দ্র, সূর্যকে শক্তির আধার হিসেবে ঠুকেছে কুর্নিশ, তাকে আজ জয় করে করেছে পদানত দাসানুদাস। যাযাবররা কিভাবে গুহা ছেড়ে পরিপাটি অট্টালিকায় বসবাসে অভ্যস্ত হল? এসব কিভাবে কি করে সম্ভব হল? একদিন গাছের ছালই যাদের আভরন আর পরিধেয় ছিল, গাছের ডালই ছিল যাদের আত্মরক্ষার ঢাল আর প্রতিরক্ষার একমাত্র অস্ত্র, আজ কি করে তা তাদের মিসাইল আর কামান বিধ্বংসী অস্ত্রে পরিণত হল? কিভাবে স্তরে স্তরে আর ধাপে ধাপে কাকে আশ্রয় করে বৃহত্তম সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলল, তাই হল শিক্ষা। তাই বলা যায়, শিক্ষা হল জাতির বিবর্তনের মূল উৎস, সজাগ সমাজ গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। আর সভ্যতা হল সংস্কৃতির বাহন। একমাত্র শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই মানুষ এ পর্যায়ে উপনিত হয়েছে।

সক্রেটিসের মতে ‘Knowledge is power by which things are done.’ এ জন্য অনেকেই জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সক্রেটিসের মতো বেকন ও কমেনিয়াসও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা জীবনের বস্তুগত, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক সকল জ্ঞানকে অপরিহার্য (Sine qua non) বলে বিবেচনা করেছেন।

জ্ঞানকে নিছক ‘জ্ঞানের জন্য জ্ঞান’ হিসেবে না দেখে ‘প্রকৃত জ্ঞান’ (True knowledge) রূপে দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে জন্যই সক্রেটিস

বলেন, 'One who had true knowledge could not be other than virtuous" (Tengja: 1990-29) সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ধারণাকে সাধারণত প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নৈতিক চরিত্র গঠনই মূল লক্ষ্য

আজকের আধুনিক পৃথিবী একথাই প্রমাণ করছে যে মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। এ জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দটিই ছিল 'ইক্‌রা'। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুব সমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার পরামর্শ তিনটি – পড়, পড় এবং পড়।'

প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্তার সমন্বয়- দেহ, মন ও আত্মা। এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে এক একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, নানা সামাজিক কার্যক্রমে তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের ওপর। এ জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন: Education is the harmonious development of body, mind & soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বক্ষনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।" কোন জাতির সন্তানকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা।

মিসরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।'

মানুষ বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তসারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় দামি দামি ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতি (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থবিত্তের অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না। Education does not necessary mean mare acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে আমরা স্কুল কলেজে এ কথা লিখে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন বাস্তব ফল পাচ্ছি না। মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনীয় হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull এর মতে, 'If you teach your children three R's : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R' : Religion, then you will get a fifth 'R' : Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান (Informative knowledge) যদি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়।'

অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চরিত্রবান শাসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষার কথা বলেছেন, যার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। আধুনিককালের অনেক দার্শনিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। চরিত্রের বিষয়টি মূল্যবোধযুক্ত প্রপঞ্চ হওয়ায় দেশে দেশে চরিত্র গঠনের আদর্শ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের আচরণের প্রধান দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো 'প্রবৃত্তিতাড়িত ও বর্বরতা' এবং অন্যটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতা'। তাঁর মতে শেষোক্তটি হলো নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এবং এর বিকাশ সাধন করা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) মতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তিনি 'Aesthetic Presentation' শীর্ষক তাঁর গবেষণা কর্মে উল্লেখ করেছেন, 'The one and the whole work of education may be summed up in the concept-morality.' তাঁর মতে আদিম ও নীচু প্রকৃতি অবদমন এবং উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে নৈতিকতা। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাবিদ চরিত্রের ধারণা প্রদান করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন ধারণা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো দিককে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– (ক) জীবনে উচ্চ মূলবোধের উপলব্ধি ও চর্চা (Realization and practice of higher values in life), (খ) মনের প্রশিক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি (Training of mind or will-power), (গ) সুশৃঙ্খল সহজাত প্রবৃত্তি (discipline of instincts) এবং (ঘ) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে নৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করা (changing instinctive behaviour into moral behaviour)। পূর্বোক্ত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এসব দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা

মহানবী (সা) বলেছেন, "মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হল উত্তম আখলাক।" যার চরিত্র ভাল, ব্যবহার সুন্দর সে সবার প্রিয়। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।" আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো,

অ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায়ও সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিকতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন।

বস্তুগত সভ্যতার অগ্রগতি মানব সমাজে রাজনৈতিক টানাপড়েন, অর্থনৈতিক চাপ এবং সামাজিক সমস্যা বাড়াচ্ছে। ফলে সমাজজীবন ক্রমেই অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দার্শনিক শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন সাধনের ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ঋষি ও চিন্তাবিদদের ধারণার কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, দয়ানন্দ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ আধুনিককালের মনীষীগণও শিক্ষার এ দিকটির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রাধাকৃষ্ণান শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'The aim of education is neither national efficiency nor world solidarity, but making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit, if you like.' (Taneja : 1990:35) 'বস্তু' ও 'আত্মা'র মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণানের গবেষণা ও চিন্ত াপ্রসূত সিদ্ধান্ত হলো এই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সর্বত্র বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এটিকে তিনি মানুষের জন্য অশুভ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে, 'Man is essentially a spiritual being. It is this spiritual element of man which is responsible for all the great achievements in this world. (Purkait : 2001:86) এ কারণে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক শক্তিতে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার ওপর এতই জোর দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগৎ যেন কখনই মানুষ, মানবতা ও বস্তুবহির্ভূত চিরায়ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে।

এ জন্য রাধাকৃষ্ণান আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'The prime task of education is to awaken the spiritual needs in the children in order to enable them to adopt and adjust themselves to the changing patterns of the society. Lack of spiritual equalities will not only make them ill-adjusted but will plunge the world into chaos and disorder. Sooner the importance of spiritual education is realised, better will be for

the world and its dynamic continuance.' (Taneja : 1990:35) তাঁর উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষার এ লক্ষ্য শাব্দিক অর্থে শুধু 'আধ্যাত্মিকতা' (Spiritualism) নয়, মানবজীবনের সর্বজনীন উপলব্ধি এবং পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে আত্মিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তাতেও আত্মিক উন্নতির প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি শিক্ষা বলতে অন্তরের বিকাশকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নর-নারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' (বিবেকানন্দ: ১৯৮৫:১)

অরবিন্দ 'জ্ঞান'কে সার্বিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান 'আত্মিক' ও 'অশেষ'। জ্ঞান কখনই নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না, তাকে কেবল আবিষ্কারই করা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছেন 'He is the expression of Divine in the individual form. This divinity has to be manifested through education.' (Purkait : 2001:72)

সে জন্য শিক্ষায় আত্মিকতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'Material progress is a good things; social and political reforms are even more valuable, both to the race and the individual; their final worth lies in the aid they afford to spiritual life.' (Findlay : 1968:41)

সক্রেটিস জ্ঞান আহরণের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে 'Gnothi Seautin' অর্থাৎ নিজেকে জানো (Know thyself)। তিনি বলেছেন, 'চিন্তা করো, জ্ঞান অর্জন করো এবং নিজেকে জানো'। নিজেকে জানা ব্যতীত মানবজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। নিজেকে জানার অন্যরূপই হচ্ছে শিক্ষা লাভ। প্লেটো মানুষের দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধনের প্রধানতম উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, মৃত ও জীবিতের মধ্যে যা তফাৎ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে তা-ই তফাৎ। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রেও শিক্ষার তাৎপর্য বিশেষরূপে বিস্তৃত হয়েছে। গীতায় উল্লেখ আছে, 'ন হি জ্ঞানের সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে'। অর্থাৎ জ্ঞানের মতো বিশুদ্ধকারক আর কিছুই নেই। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে শিক্ষাকে মনে করা হতো 'আত্মনির্ভরশীল করা ও আত্মকামনা ত্যাগ করার পন্থা' হিসেবে। উপনিষদে বলা

হয়েছে, 'শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে)। পাণিনির লেখার মধ্যে দেখা যায়, প্রকৃতি বা পরিবেশের কাছ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা শেখে, তার সমষ্টি হচ্ছে শিক্ষা। কনাদ বলেছেন, 'শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হলো এই যে, এর দ্বারা মানুষের আত্মতৃপ্তির (Self contentment) যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়।' প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'শিক্ষা সৎচরিত্র গঠন এবং সমাজ উপযোগী ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক কৌশল।' কৌটিল্যের মতে, 'শিক্ষা হলো দেশ ও জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ।' ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের মতে শিক্ষা হলো 'আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি' (realisation of self)।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষা গ্রহণকে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে S.N.O Zulfaqar Ali তাঁর "The Modern Teacher" গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'In the Quran education has been urged as a duty. It is to be noted that the holy book opens with the verse Ekra Bismee Rabbika llaji Khalaqa': Read in the name of the Lord and that the very title Quran which is derived from the word Kara'a means the thing reads.'(Ali : 1968:3) ইসলামে শিক্ষাকে সবার ওপর স্থান দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবজীবনে শিক্ষার তাৎপর্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এগুলো হলো :

ক) শহীদের রক্ত অপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তির দোয়াতের কালি অধিক পবিত্র।

খ) শৈশব হতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।

গ) প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য জ্ঞানান্বেষণ অবশ্য কর্তব্য।

ঘ) যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বর্গীয় উদ্যানের তুল্য।

ঙ) জ্ঞানান্বেষণকারীর সম্মুখে ফেরেস্তাগণও মস্তক অবনত করে।

চ) যেদিন আমি কোন নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারি না, সে দিনটি আমার জীবনের অংশ নয়।

ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উনিশ শতকের তথা আধুনিককালের মুখপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন, "শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কিছু নয়।"

অন্তর্নিহিত সত্তা বলতে তিনি অধ্যাত্মভাবকে (Spirituality) বোঝাতে চেয়েছেন। অরবিন্দ বলেছেন, তরুণদের বিকাশমান আত্মসত্তাকে পূর্ণ বিকাশ

করার প্রয়াসই হলো শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের অধ্যাত্মভাবের ওপর গুরুত্ব দেখতে পাই। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, 'শিক্ষা কথার প্রকৃত তাৎপর্য জীবিকা অর্জনের বা নাগরিকতার প্রশিক্ষণের গণ্ডির মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা হলো দ্বিতীয় জন্ম। উন্নততর অধ্যাত্মময় জীবনে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো শিক্ষা'। বেগম রোকেয়া সমাজ উন্নয়নে পুরুষ ও নারী উভয়ের শিক্ষা লাভের ওপর সমান জোর দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল মানবসমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তিনি শিক্ষাকে প্রধান বাহন হিসেবে গণ্য করেন। সাথে সাথে স্বদেশের উন্নয়নে তিনি দেশ মাতৃকার সহযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ওপর জোর দেন।

আধুনিককালে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণও শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনায় বিশেষ তৎপর হয়েছেন। তাদের মধ্যে লুথার (জার্মানি), মনটেইন (ফরাসি), বেকন (ব্রিটেন), দেকার্তে (ফরাসি), লক (ব্রিটেন), রুশো (ফরাসি), পেস্টালৎসি (সুইস), হার্বার্ট (জার্মানি), ফ্রোয়েবল (জার্মানি), ডিউই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রাসেল (ব্রিটেন), পাওলো ফ্রেইরি (আর্জেন্টিনা) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ব্যতীত একটি জাতির টিকে থাকা সম্ভব নয়– এমনই মন্তব্য ধ্বণিত হচ্ছে আধুনিক কোন কোন শিক্ষাচিন্তাবিদের কণ্ঠে। এমনই একজন শিক্ষাবিদ লর্ড সিপি স্নো তাঁর 'The Two cultures and the Scientific Revolution' শীর্ষক Rede Lecture-এ বলেছেন, 'To say, that we must educate or perish, is a little more melodramatic that the facts warrant. To say, we have to educate ourselves or watch a steep decline in our life time, is about right.' (হোসেন : ১৯৯:১০)

এ মন্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে– আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। কথাটি কিছুটা অতিরঞ্জিত শোনাতে পারে। বরং কথাটিকে যদি এভাবে বলা যায় যে, নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জীবদ্দশায় আমাদের অতল খাদে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে।

আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important'. তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।' তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, মানসিক বিকাশ। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, চরম সভ্যতায় উন্নীত করে, পরম আলোকে পৌঁছে দেয়।

মানবজাতির আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্তার ও মানবতার বিকাশ সাধনের জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম লগ্নে সভ্যতা ও ভদ্রতার খোলসে উদভ্রান্ত মানবজাতি মানবিক গুণাগুণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নির্লজ্জ যৌন ব্যভিচার, পরস্পর হানাহানি, শক্তিমত্ততা, বর্বরতা ও পাশবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে বড়ই অসুস্থ, বিশৃঙ্খল ও অরাজক হয়ে উঠছে। ফলে মানব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ওপর আল্লাহ পাক ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। শিক্ষার পূর্ণতা লাভ ঘটেছে তাঁরই হাতে। তাই ইসলামী শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্যোক্তা। আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, ফেকাহ প্রভৃতি জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে প্রযুক্তিগত চাহিদা-সম্পৃক্ত একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এ শিক্ষায় বিধৃত রয়েছে। এখানে কেবল আরশ আর কবরের খবরই দেয়া হয়নি; মানুষের জীবনের সমুদয় কর্মকাণ্ডের সুনিব্যস্ত সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিধান দান করা হয়েছে।

(কবি মোজাম্মেল হক বলেন : শিশু বালক দেখবি যারে তারেই দিবি শিক্ষাগারে/ এমন করে সমাজ তরুর ঢালবি মূলে জল/আজকে তোরা চল।)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক মসজিদই আমাদের শিক্ষাগৃহ এবং প্রত্যেক খতিবই আমাদের শিক্ষক। আমরা যদি তাদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি, তবে আমাদের আর কিসের অভাব? রাসূলুল্লাহর সময় এরূপই ছিল।" আজকের জগতে বিদ্রোহী তারুণ্য কোন আদর্শের পরিচয় না পেয়ে হয়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির মত ধ্বংসকারী। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়, ক্লেদ, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা, ব্যভিচার, কুটিলতা,

হানাহানি, জুলুম নির্যাতন এবং কথা ও কাজের গরমিল সবুজ তারুণ্যকে দিশেহারা করে তুলেছে। এমতাবস্থায় বিদ্রোহী তরুণ সমাজের কাছে ইসলামের আদর্শের শিক্ষা তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

(আল্লামা ইকবাল বলেন : জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা/ফকিরের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অন্তর ও দৃষ্টির/আত্মার অসি যখন শাণিত হয়/ ফকিরের শান পাথরের/একটি মাত্র সৈনিকের শক্তি/অর্জন করে একটি বাহিনীর।)

সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযোগ্য ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে সৃজনী শক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ ঘটানোই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে। শিক্ষা যদি জীবনে কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়, শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা : "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ।" প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য প্রাণীর শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। তাই শিক্ষার মৌলতত্ত্বের উপরই নির্ভর করছে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি।

জুলাই, ২০০৯

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তরালে ভারতে মুসলিম নিধন

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-র সংজ্ঞা

ধর্মনিরপেক্ষতা ইংরেজি (Secularism)-র বাংলা প্রতিশব্দ। Sceular রাষ্ট্র দর্শনের অপর নাম Secularism. Secular অর্থ ইহলৌকিক, পার্থিব, পরকাল বিমুখতা ইত্যাদি।

"র্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not perlaining toor connceted with religious) এবং যা কোনো ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিপপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

Oxford Dictionary-তে Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life to be exclusion of all consideration draw from belief in god or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ এর মতে-"The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকেনা- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করেনা। বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যানধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি কোথায়

চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসী বিপ্লব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

মুসলিম বিশ্বেও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল আল-ইসলাম। কিন্তু পশ্চিমা উপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে Secular ভাবধারার প্রসার ঘটে। মোস্তফা কামাল-এর নেতৃত্বে Secular তুর্কী গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে Secular রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমকে ইসলামমুক্ত করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়াপত্তন করেন। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে Secular রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ধর্মহীনতার আরেক নাম ধর্মনিরেপেক্ষতাবাদ

আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা নতুন কোনো বস্তু নয়। এটি মহানবী (সা)-এর কাল থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত একটি অতিশয় পুরানো কৌশল। আবু জেহেলরাও

একটি প্রস্তাব নিয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়েছিল, তার ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদকে সম্মত করার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। পিতৃব্য আবু তালিবের পেশকৃত প্রস্তাবের জবাবে মুহাম্মদ (সা) কি বলেছিলেন তা আমাদের অজানা নয়। তায়েফ হতে আগত কতিপয় গোত্রপতি সদ্য মুসলিম যখন রাসূল (সা)-কে বলল, তায়েফবাসীরা সবাই মুসলমান হতে চায় না। তারা ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হতে চায়। শুধু একটি ছোট প্রার্থনা, তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের উপাস্য পুতুলটিকে নিজগৃহে রক্ষা করতে চায় তবে পূজার জন্য নয়, এমনিতেই নিতান্ত সংস্কারবশত। তায়েফবাসীদের এটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু রাসূল (সা) কি বলেছিলেন? বলেছিলেন– তাদের মুসলমান হবার প্রয়োজন নেই, এভাবে মুসলমান হওয়া যায় না।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদী হতবুদ্ধিজীবীরা, এমনকি খোদ শেখ হাসিনাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কুরআনের আয়াতকে হাদিস বলে চালিয়ে দেন- তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে। এটা তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ধর্মহীনতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অথচ পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ এবং এই ইসলামই যেহেতু অন্যান্য বিকৃত মতাদর্শগুলোর সম্মুখে একটি বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ, আর তার মোকাবেলায় ধর্ম থেকে মানুষকে বিছিন্ন করা, বিরত রাখার মধ্য দিয়েই ধর্মরিপেক্ষতা তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। অবস্থাটা এমন যে, এই পঁচা মতবাদের দোকানদাররা তাদের দোকানে যে মালামাল নেই তা অন্যকে বিক্রি করতেও দেবে না, এই সিদ্ধান্তেই তারা অটল। আর যেহেতু ইসলামই মানুষকে দিয়েছে সব কিছুর সমাধান। সুতরাং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাবমুক্ত রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল লক্ষ্য। এ মহান উদারতার খোলস পরেই মূলত ধর্মরিপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত। এই চিরন্তন লড়াই রাসূলে করীম (সা)-এর সময়েও ছিল। যখন আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মানব সমাজে কায়েমের আওয়াজ তুলেছেন ঠিক তখনই শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে নানা অজুহাতে বিরোধীতা করা

হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সাথে নমরুদের, মুসা (আ)-এর সাথে ফেরাউনের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আবু লাহাব-আবু জেহেলদের দ্বন্দ্ব ছিল চিরন্তন। আজও সেই লড়াই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। তাদের অনুসারীদের ভাষা এবং কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ইসলামের উপর আঘাত হানছে সমান গতিতেই এবং আরো অতিমাত্রায়। তাইতো ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকেও তারা রক্তাক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ঠিক আজও সে ধারা অব্যাহত। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পৃথিবীর তিন বড় বড় ধর্মাবলম্বীদের হাতেই মুসলমান নিগৃহীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এরাই হলো ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু সম্প্রদায়।

রক্তে রঞ্জিত ভারত

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। এশিয়ার এদেশটির একটি বিশিষ্ট সত্তা রয়েছে। প্রাচ্য যে আত্মার সম্পদে ধনী তা এ দেশটির এক সময়ে যথেষ্ট ছিল। এদেশের বুক থেকে মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধ অহিংসার বাণী ছড়িয়েছিলেন সারাবিশ্বে। সে তো আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। এরপরও বিভিন্ন যুগে প্রেম ও অহিংসার বাণী নিয়ে যুগে যুগে এদেশে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। চলতি শতকেও এদেশের কোনো কোনো দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতার মুখেও প্রেম ও অহিংসার বাণী শোনা গেছে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুটি মুসলিম প্রধান দেশ। বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘুর বাস। এখানে দীর্ঘকাল ধরে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে না। কিন্তু এটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের গভীরতম বিশ্বাস যে, ভারতে যা কিছুই ঘটে তাই ধর্মনিরপেক্ষ। প্রগতিশীল এবং সংস্কৃতির সুষমামণ্ডিত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যেই ভারতে মোট ৮৯৪৬টি মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে এবং ভারতীয় হিসাবেই এতে নিহত হয় ৮৯৬৫ জন এবং আহত হয় ৪৭৩১১ জন মুসলমান। (ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা "ফ্রন্টলাই" ১৫ নভেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যা)

অথচ হিন্দু প্রধান ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা সব সসয় বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন? এর কারণ কী? এক শ্রেণীর উগ্রবাদী হিন্দু মুসলিম নিধনের মানসে সবসময়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমেই উস্কানিমূলকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে রক্ত-

পিপাসু হিন্দুদের। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক নীরদ সি. চৌধুরী শারদীয় সংখ্যায় বাংলাদেশকে তথাকথিত বাংলাদেশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন- "একজন মুসলমান পাঠান হতে পারে, তুর্কী হতে পারে, মুঘল হতে পারে, কিন্তু কখনই ভদ্রলোক হতে পারে না"। (উপসম্পাদকীয়, দৈনিক বাংলার বাণী, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯৩) এবার একটু অতীতের দিকে ফিরে দেখা যায়। "আনন্দসর মঠ," "রাজ সিংহ," "দুর্গেশনন্দিনী" ইত্যাদি উপন্যাসে তীব্রতম মুসলিম বিদ্বেষের বিষ যিনি ছড়িয়েছেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নামিদামি লেখকরাও।

করুণ আর্তনাদ

সম্প্রতি গুজরাটের স্টেশনে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নি সংযোগের একটি সাজানো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একশ্রেণীর উগ্র হিন্দু যে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক নৃশংসতা চালায় তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করে। উগ্রবাদী হিন্দুদের এসকল বর্বরতা, হিংস্রতা আইয়্যামে জাহেলিয়াতকে হারই মানায়নি বরং নয়ামাত্রা যোগ করেছে। এই হত্যাযজ্ঞ শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় আর রাষ্ট্রীয় ইউনিফর্ম পরা রক্ষকদের সহযোগিতায় সংঘঠিত হয়েছে।

এদিকে বাজপেয়ী বলেছেন, এটা কোনো দাঙ্গা নয় বরং যেখানেই মুসলমান সেখানেই এ জাতীয় ঘটনা ঘটে। এ বক্তব্য মুসলমানদের কাটা ঘায়ে নুন ছিটানো, দায়িত্বহীনতা ও নির্লজ্জ মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। নিরীহ নিরাপরাধ মানুষের রক্তপানের জন্য এত ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে উগ্রবাদী মানুষখেকো হিন্দুরা, তা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। তাদের এই পৈশাচিক ঘটনায় আটমাসের অন্তসত্তা মায়ের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে সেই মায়ের সামনে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। যার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার একটি অমৌলবাদী পত্রিকায়।

১৬ এপ্রিল ২০০২ দিল্লীর মুসলিম উইমেন ফোরামের সৈয়দা হামিদ, বাঙ্গালোরের ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব হিউম্যান্স রউথ মনোরমা, আহমেদাবাদের শিবাজর্জ, দিল্লীর ফিন্যান্স সাংবাদিক ফাহারহ নাকভির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩ মে ২০০২ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে মর্মস্পর্শী ঘটনাটি। এ হৃদয়বিদারক বিবরণ দিয়েছেন কুলসুম বিবি, রেশমা বেগমসহ অনেকেই। আহমেদাবাদের জওয়ান নগরের পিছনে ছাড়া বস্তির তের বছরের আজহার উদ্দিনের বর্ণনায় 'আমি গুড্ডু

ছাড়াকে দেখেছি ফারজানাকে ধর্ষণ করতে। পরে তাকে পোড়ানো হয়।' ১২ বছরের নুরজাহানও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। ধর্ষক গুড্ডু, সুরেশ, নরেশ ও হরিয়া উলঙ্গ উন্মুক্ত সিংহরা ছুটে চলেছে মুসলিম নিধনে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য পরিবহনকর্মী ভবানী সিংকে দেখেছি একটি বালক ও পাঁচজনকে হত্যা করতে। আব্দুল ওসমান বলেছেন, তারা আমার ২২ বছরের মেয়েসহ এলাকার মা-মেয়েদের নগ্ন করেছে। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমার স্ত্রীসহ আমার পরিবারের ৭ সদস্যকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আমি হারিয়েছি আমার পরিবারের সকলকে। এই নগ্নতা দেখে মনে হয় ঐ হিন্দু যুবকদের জন্ম কোনো মায়ের ঔরশে নয়। সুলতানি জানায় তারা আমাদের গাড়ির গতিরোধ করে। আমার কোলে ছিল আমার ছেলে ফৌজান। চারদিক থেকে সশস্ত্ররা ছুটে আসে আমার দিকে। শত শত মানুষের সামনেই আমার সম্ভ্রমহানি করা হয়। সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করাই যেন ভাল ছিল। আর তাদের এই পালাক্রমের নির্যাতনে এখন যে আমার ছোট্ট শিশু ফৌজার ছিটকে পড়েছে তা আমি জানি না। কিন্তু যতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আমি আমার শিশুটির কান্নার আওয়াজ 'মা মা' শব্দ শুনছিলাম। পঞ্চমোহন জেলার মদিনা জানান, আমার শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। আমরা সবাই পালিয়েছি কিন্তু তিনি মনে করেছেন তাকে কেউ কিছু করবে না। কিন্তু তাদের হত্যার শিকার হয়েছেন তিনি।

মদিনা আরও বলেন, এইভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম অসংখ্য নির্যাতিত মহিলার গগনবিদারী আর্তচিৎকার, মা-হারা শিশুদের কান্না, অসংখ্য মানুষ পোড়ানোর গন্ধ, যা ভারতের আকাশ বাতাসকে ভারী করে তুলেছিল। কিন্তু কেউই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এটি কোনো সভ্য সমাজের ইতিহাস নয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর মোতাবেক সাম্প্রতিক দাঙ্গায় সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে শত শত মুসলমানকে। নিহতদের মধ্যে একজন সাবেক এমপি-ও রয়েছেন। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ- রাজ্যের চৌদ্দ হাজার মুসলমান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রায় ৯০ ভাগই প্রাণের ভয়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেনি। তাদের মূল্যবান একটি শিক্ষাবছর এমনিভাবেই খসে পড়ল তাদের জীবন থেকে।

ভারতে কেন এ সাম্প্রদায়িকতা

এটি আজ নতুন নয়! শুরু থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী ভারত ১৯৭৪ থেকে এ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমর্থ হয়নি একদিনের জন্যও।

সংখ্যালঘুদের জানমালের মূল্য সেখানে পানির চেয়েও সস্তা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে ভারতে এই ধর্মনিপেক্ষতা কি শুধু একটি খোলস মাত্র? ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরা হয়েছে কি শুধু সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করার জন্য?

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতার থেকে সম্প্রতি একটি পর্যালোচনামূলক পরিসংখান প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখানো হয় যে, বিগত বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো বিশেষ করে এমন সব শহরে বেশিরভাগ অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সমৃদ্ধ।

এই হিসাবে ভারতে প্রতি বছর গড়ে ২৬৫টি বিরোধী দাঙ্গা সংঘঠিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯০৫টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের মার্চ খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিস্তারিত তালিকা প্রদান করে দেখান যে, ঐ সময় পর্যন্ত শুধু কলকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ, ৭টি মাজার, গোরস্তান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ২০/১ বেলগাছিয়া রোডস্থ দোতলা মসজিদ থেকে শুরু করে ১৯৭ বৌবাজার স্ট্রীটস্থ মাজার পর্যন্ত ৫৩টি মসজিদ-মাজারের নাম। এই অনুপাতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী কি বিশাল মসজিদ মাজার হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি ভারতে উগ্রবাদী হিন্দুরা ভারতের সুপ্রিমকোর্টের রায় অমান্য করে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার বুকের উপর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে এবং ভারতের নরশিমা রাও সরকার সুপ্রিমকোর্টের রায় ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

১৯৪৭ সাল থেকে এ যাবৎ কাশ্মীরের মুক্তিকামী মানুষের উপর লাগাতর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করছে। ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরী মুসলমান মহিলাদের শ্লীলতাহানী করছে এবং এই নির্যাতনের প্রক্রিয়া দিনে দিনে ভয়াবহ করে তোলা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক পত্রিকা টাইমস-এ "ওদের জ্বালিয়ে দাও" শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকারে শিবসেনা নেতা বালথ্যাকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন-মুসলমান নয়, ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। মুসলমানরা যদি ভারত থেকে চলে যেতে না চায় তাহলে ওদের লাথি

মেরে বের করে দেওয়া উচিত। উপরোক্ত বক্তব্য ও তথ্যাদি সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবিদার হাসিনা, তোফায়েল, সামাদ আজাদ, শাহরিয়ার, গফুর ও মুনতাসির মামুনদের বক্তব্য কি? আপনারাও কি মনে করেন হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ ধ্বংস, মুসলমান হত্যা, নারী ধর্ষণ খুবই ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল কাজ? আপনারাও বালথ্যাকারের সাথে একমত যে, ভারতের প্রায় ২৫ কোটি মুসলমান ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত? নতুবা ভারতের সব মুসলমানকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়া বা হত্যা করাই বিধেয়? করুন না একটু আত্ম-বিশ্লেষণ। দেখুন না, আপনারা যারা তথাকথিত ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, প্রগতিবাদীদের অনুসরণ করছেন তারা হিন্দু ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কি ভূমিকা পালন করছেন?

আপনারা তো বিশ্বাস করেন যে, ভারত ও হিন্দুরা যাই করে তাই সঠিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। এবার দেখুন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মানবেন্দ্রনাথ রায় এ ব্যাপারে কি বলেছেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "Historical Role of Islam" গ্রন্থে তিনি বলেছেন- "ভারতের বেশিরভাগ মানুষই গোড়া হিন্দু।" মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে "শ্লেচ্ছ", "অশুচি", "বর্বর"। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্ত তার চেয়ে ভাল ব্যবহার এদের বিচারে কোনো মুসলমানেরই প্রাপ্ত নয়। মুসলমান যতই সদ্বংশজাত হোক, সংস্কৃতিবান হোক, গোঁড়া হিন্দুর বিচারে এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ভবানীসেন গুপ্তের ভাষ্যেও একই কথা ফুটে উঠেছে। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মজলুমী আজ আমাদের চোখের সামনে। মুসলমানদের সংখ্যা দুনিয়ায় বর্তমানে প্রায় একশ চল্লিশ কোটির মত। এর মধ্যে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় তাদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান বাস করছে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম শাসিত দেশগুলোতে। এর মধ্যে কোনো কোনো অমুসলিম দেশে শাসনযন্ত্রের কোনো কোনো পর্যায়ে মুসলমানদের কিছুটা সহযোগিতা গ্রহণ করা হলেও দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রায় দেশেই মুসলমানদেরকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে সর্বত্রই মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নটা বড় আকারে দেখা দিয়েছে।

এসব অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে ত্রিশের মধ্যে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ফিলিপাইন থেকে শুরু করে

ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ইন্ডিয়া, ইথিওপিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন চলছে সমানে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, ইসরাইল ও আধিপত্যবাদী ভারতের নখরের আঘাতে আজ আফগান-ফিলিস্তিন-কাশ্মীর ক্ষতবিক্ষত। এদের আক্রমণের তালিকায় নাম্বারিং করা প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করা হয়েছে। হিংসার সেটা ছিল এক অভিনব দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি ভারতে একটি মুসলিম জাতিকে একটি দেশের বুক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এ ধরনের আক্রোশ আর কোথাও দেখা যায়নি। তাহলে প্রশ্ন, মুসলমানরা কি আগ্রাসী? মুসলমানদের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব রয়েছে? সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা কি ইসলামী সমাজে দুষ্প্রাপ্য বিষয়? এ প্রশ্নগুলো এবং এ ধরনের বহু প্রশ্ন একজন দরদী পর্যবেক্ষকের মনে একের পর এক ভেসে উঠে। কিন্তু পাশাপাশি বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলোর সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেখে তাদের এসব প্রশ্ন বাতাসে মিলিয়ে যায়।

উপসংহার

এমনি দুনিয়ার আরো অনেক দেশেই সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা আল কুরআনের এই বক্তব্যেরই সত্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে। আল্লাহপাক বলেনঃ "ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমাদেরকে তাদের দ্বীনের আওতাধীন না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না"। কিন্তু ভারত যেমনি অনবরত সাম্প্রদায়িত দাঙ্গার বিষবাষ্প উদ্‌গীরণ করে যাচ্ছে এমনটি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন, গণতন্ত্র মানবাধিকার পরমসহিঞ্চুতার এই যুগে একই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে সংবিধানে সমমর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কি মুসলমানরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত হবে? গুজরাটসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জ্বালাও পোড়াও ও ধর্ষণের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তা আর কতদিন চলবে? তাদের বাঁচাতে কি কেউ এগিয়ে আসবে না? বিশ্ববিবেক আর কতদিন নীরব থাকবে! এই প্রশ্নই আজ আমাদের।

মে, ২০০৫

কাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতির স্বরূপ ও আজকের বাংলাদেশ

সংস্কৃতি শব্দটি ইংরেজি Cultureএর রূপান্তর। Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে- The customs and believe art way of life and social organization of a particular country or group European/Islamic/American Culture.

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা মনে করে সংস্কৃতি মানে গান, নাটক, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি এবং অধিকাংশ সাংস্কৃতিক কর্মজীবীরা সংস্কৃতি বলতে বোঝেন আনন্দের মহড়া। জনমনে সংস্কৃতি শব্দটি নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আজও লাভ করতে পারেনি। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নামে পরজীবীরা জাতীয় সংস্কৃতিকে বিতর্কিত করে তুলছে। কিন্তু সত্যি বলতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি একক কোন অর্থ প্রকাশ করে না। আসলে সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের দর্পণ, মোতাহার হোসেন চৌধুরী সুন্দরভাবে বাঁচাকে সংস্কৃতি বলেছেন, আবুল ফজল মনুষ্যত্ব তথা মানবধর্মের সাধনাকেই সংস্কৃতি বলেছেন।

সংস্কৃতি সম্পর্কে Britannica Ready Reference Encyclopedia গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Integrated pattern of human knowledge belief, & behavior that is both a result of and integral to the human capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding generations. Culture thus consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institutions, tools, techniques, works of art, rituals, ceremonies, and symbols. It has played a crucial role in HUMAN EVOLUTION, allowing human beings to adapt the environment to their own purposes rather than depend solely on NATURAL SELECTION to achieve adaptive success. Every human society has its own particular culture or socio-cultural system. An individuals, attitudes, values, ideals & beliefs are greatly influenced by the culture (or cultures) in which her/she lives. Culture change takes place as a result of ecological, socioeconomic, political, and religious, or other fundamental factors affecting a society.

আরনাল্ড ম্যাথিউ বলেছেন, "পৃথিবী সম্বন্ধে যা উৎকৃষ্ট বলা বা চিন্তা করা হবে তা জানাই সংস্কৃতি।" ড. আহমদ শরীফের মতে, "সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।"

নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন- "শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ বা কৃষ্টি যা তার মধ্যে নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত, বিনম্রীকৃত, শুষিত এধরনের মনোভাবসমূহ।" আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন, "কালচার বা সংস্কৃতি মানুষের মন ও বিকাশের স্তরবোধক।" এ সকল সংজ্ঞায় স্পষ্ট যে কোন সমাজ বা জাতির মনে কোন একটা ব্যাপারে একটা Standard ব্যবহার বিধি, সার্বজনীন চরিত্র আচরণ বা আখলাকের রূপ পরিগ্রহ করলেই সেটাকে ঐ মানব গোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন এইচ.জে লাস্কি। তিনি বলেন- "Culture is that what we are". এতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক।

ই.বি. টেইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেনঃ "That Complex whole which includes knowledge's, believe, arts, morals, law, custom and any other Capabilities and habits acquired by man as a member of society." "জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে আহরিত অন্য যোগ্যতা ও অভ্যাসের সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে।"

T.S. Eliot-এর মতে, 'সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ- একটি ভাবগত ঐক্য, আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক।' তার মতে ধর্ম সংস্কৃতির উৎস।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার "Discovery of India" গ্রন্থে হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছেন। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মুসলিম দেশসমূহের জীবনপ্রবাহে ইসলাম অনিবার্য তা স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়- "In Some Muslim lands here a deeps desire that state. Should is some fashio reflect the sprite of Islam." এসব দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিনির্মাণে ধর্মের মূল উপাদান হচ্ছে ভাষা। সুতরাং বলা যায় জনগোষ্ঠী অতীত ধর্মীয় চেতনা, সামষ্টিক আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, আর্থিক ব্যবস্থা সবকিছুই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

স্বকীয় সংস্কৃতি হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। কোনো জাতিকে কমজোর করে পদানত রাখতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে দূষিত ও বিনষ্ট করতে হবে। কেননা সংস্কৃতি জাতির প্রাণশক্তি, আর এই প্রাণশক্তিই জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করায়। মূলত একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে, যে চেতনার বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সেই চেতনাকে ভোতা করে দেয়। একটি জাতি কতটা সফল হয়েছে তার নিরিখে তার সংস্কৃতি স্বাধীনতার পরিমাপ করা যায়। এদিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের এই দীর্ঘ কালকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে সংস্কৃতির চেতনায় সুকৌশলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ সংস্কৃতি বিভ্রান্তিকর বলা চলে। আর একেই বলা হয় অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতির সয়লাব আমাদের সুফল থেকে আড়াল করে দিকভ্রান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্যই আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, "রাজনৈতিক আগ্রাসনের চেয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন অধিক মারাত্মক।" রাজনৈতিক আগ্রাসন হলে দেখা যায় হৈচৈ, ডামাডোল, আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিঃশেষ করে দেয়।

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির আয়নাস্বরূপ। এটা মানব গোষ্ঠীর রীতিনীতির পরিশীলিত, কর্ষিত এবং ঐতিহ্য পরম্পরাগত অনুভবের দৃঢ়তা থেকে উদ্ভূত হয়। সংস্কৃতিরও নানামাত্রিক উপাদান রয়েছে। ইসলামে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছে, তার মূল উপাদান হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাত। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি, পবিত্রতা, দায়িত্ববোধ ও ভারসাম্য। এগুলোর পরিপন্থী এমন কোনো উপাদান ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্গত হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ব্যাপ্তি যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল এর সৌকর্য ও সৌন্দর্য।

সংস্কৃতি সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি খুবই প্রণিধানযোগ্য:'হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার গৃহে হযরত আবু বকর (রা) দুটো আনসারী বালিকা সহ প্রবেশ করলেন। বালিকা বু'আস যুদ্ধের দিনে আনসারগণ পরস্পরে যেসব ললিত কাব্যগাঁথা উচ্চারণ করতো ওরা তা উচ্চারণ করছিলো। তিনি বলেন, ওরা পেশায় গায়িকা ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে শয়তানের বাজনা! সেটা ছিলো ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ-উৎসব আছে, হে আবু বকর, আজ তো আমাদের ঈদ।' সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার অভাবে একটি স্বাধীন সিকিমকে পরিণত হতে হয় এক অঙ্গরাজ্যে। আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে A Victory without war এবং এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিক হচ্ছে দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। বস্তুত বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি–

(ক) আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ,

(খ) পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র,

(গ) অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র।

এর মধ্যে আধিপত্যবাদী আগ্রাসনই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, যা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা নিয়ে দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই বিভ্রান্তি চলছে। এ দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা, হীনমন্যতা, ভীনদেশপ্রীতি, তার সাথে আধিপত্যবাদীদের রাজনীতি অভিলাষ চরিতার্থের চক্রান্তই এই বিভ্রান্তির কারণ।

আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, মুসলমানদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি হিসেবে বারবার গরমিল হয়েছে। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তাদের অধিকার, নখরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার জনগোষ্ঠী। হারিয়েছে তাদের সোনালি ঐতিহ্য। এটিই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়– এটা সত্য। আবার দুটো ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস হয়েও এরা পরস্পর সম্পর্কিত। মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সব সমাজেই রিলিজিয়নের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। রিলিজিয়নকে মনে করা হতো সংস্কৃতির উৎস। রিলিজিয়নই মানুষের চিন্তা ও কর্মের ওপর কর্তৃত্ব করতো এবং এখনও বহু সমাজে তা করে থাকে। এর কারণ ধর্মের একটা জীবনবোধ বা আইডিয়লজি থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম আবার সংস্কৃতিকে সৃষ্টি ও নির্মাণ করে। তাই একভাবে বলা যায়, ধর্ম যেমন সংস্কৃতির অংশ তেমনি ধর্ম আবার সংস্কৃতির স্রষ্টাও। যেখানে ধর্ম সংস্কৃতির স্রষ্টা, সেখানে সংস্কৃতি ধর্মেরই অংশ। ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক তাই বৈরিতার নয়, বরং সহযোগিতার।

ইউরোপের পণ্ডিতরা আমাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন কালচারের মত ধর্মের লক্ষ্য সৃষ্টি নয়, এটি হচ্ছে মূলগতভাবে স্থিতিধর্মী। ধর্মের যে জীবনবোধ তা শাশ্বত বা চিরন্তন। তাকে পরিবর্তন করা যায় না। এটা তার নিজস্ব গৎবাঁধা 'কোড'। এক যুগের কোড দিয়ে ধর্ম চায় সকল যুগের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ ছকে বেঁধে ফেলতে। এই পণ্ডিতদের ধারণা– 'ধর্ম সৃষ্টি করে না, ধর্ম সৃষ্টিকে আটকিয়ে রাখে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ধর্ম-বিষয়ক বিবেচনা আদৌ সঠিক নয়। যুগের সাথে মিলিয়ে ধর্মের চলবার মত এক ধরণের নিজস্ব ডায়নামিজম আছে। একটা নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতা ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা না থাকলে যুগ-যুগান্তরব্যাপী মানবসমাজে ধর্ম টিকে থাকতে পারতো না কিংবা ধর্মের প্রেরণায় দেশে দেশে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, আইডিয়লজি, সমাজসংস্কৃতি সৃষ্টির বান জাগতো না।

মুসলিম সংস্কৃতি

মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে আদর্শভিত্তিক। আল কুরআনে ইসলামকে 'দ্বীন' বলা হয়েছে। দ্বীন মানে হচ্ছে জীবন দর্শন বা জীবনের একটা সুষ্ঠু আদর্শবাদ। মুসলিম সংস্কৃতি এই আদর্শবাদের ভিত্তিতেই বিকশিত হয়েছে। কোন কোন সংশয়ী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অভিমত হলো– সংস্কৃতির উত্থানে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। তাদের এই যুক্তি ইসলামের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। ইসলামের বিপুল জীবনী শক্তি ও রাসূলের (সা) অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণেই মুসলিম সংস্কৃতির ফুল ফুটে এবং প্রথমে আরবে, পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার খুশবু ছড়ায়। এইভাবে ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতে মুসলিম সংস্কৃতি আর সেই সংস্কৃতির বুক চিরে মুসলিম সভ্যতার পত্তন হয়। মুহাম্মদ আসাদের মত বুদ্ধিজীবীও মনে করতেন, 'কুরআনের নীতিই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের পূর্বশর্ত।' তাঁর ভাষায়– 'Ours was an ideological civilization- with the ideology of the Quran as its source, and more than that- for its only justification.'

এ কারণেই মহাকবি আল্লামা ইকবাল দাবি করেছেন, মুসলিম সংস্কৃতি হলো মূলত ধর্মগত সংস্কৃতি। প্রকাণ্ড মুসলিম জগতের পরস্পরের মধ্যে যে মিল তা এই ধর্মগত সংস্কৃতির মিল। সে মিল ইসলামের ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত নিয়মনীতির মিল। আমরা যে মুসলিম উম্মাহ কথাটা বলে থাকি সেটা এই ধর্মগত সংস্কৃতির জোরে। আবার যে brother in religion কথাটা আমরা ব্যবহার করি

তাও একই সূত্রে। মুসলিম সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তৌহিদ। এর অর্থ মানজীবনে তৌহিদের নীতি প্রতিষ্ঠা এবং এই নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদের বিকাশ সাধন করা।

মুসলিম জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্য স্বচ্ছ হয়ে বাঁচতে চায়নি বলেই "দ্বিজাতি তত্ত্বের" ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছিল। তার ভিত্তিমূল ছিল সাম্য এবং আল্লাহর একত্ববাদ। সেই একই স্বাতন্ত্র্য চিন্তা বজায় রেখে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে দিল্লী-কোলকাতার গুরুদের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের প্রিয় ইসলামের ঐতিহ্যভিত্তিক যেসব নাম নিশানা ছিল তার বিরুদ্ধে শুরু হলো সর্বাত্মক উচ্ছেদ অভিযান। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা হয়, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মুসলিম নাম বাদ দেয়া হয়। জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দেয়া হয় মুসলিম নাম। নজরুল ইসলাম কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নজরুল কলেজ। অথচ জগন্নাথ কলেজ, জগন্নাথ হল, হোমস, নটর ডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, সেন্ট গ্রেগরী কলেজ সবই রয়ে গেল অপরিবর্তিত। মুছে গেল শুধু ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত নামগুলো। বন্ধ করে দেয়া হলো অনেক মাদ্রাসা। অবস্থা এতই শোচনীয় হলো যে, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ সরকারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সরকারকে আগুন নিয়ে খেলা না করার আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিপজ্জনক প্রবণতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীদের অবস্থান আধুনিক যোগাযোগের কারণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের দেহ ও মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র ও ভিডিও না যতখানি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর তার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর প্রবাসী কর্তৃক সংস্কৃতির আবর্জনা তথা আমদানি Live together (মুক্ত যৌনাচার)- এর ফল এইডসের মরণব্যাধির আগ্রাসন, নানা ধরনের কনসার্ট, ব্যান্ড বিশেষ করে পাশ্চাত্যের পোশাকের নামে উলঙ্গপনা আমাদের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশ সংস্কৃতির নামে ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে আজকে প্রতিটি ঘরে ঘরে ব্লু-ফিল্ম এমনকি টিভি সেক্স (?) দিয়ে আমাদের পারিবারিক বন্ধনে দারুণভাবে আঘাত হানছে, আর এই পাশ্চাত্য সভ্যতার অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে আমাদের সমাজের কেউ রেহাই পাচ্ছে না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি একবার নিজের অজান্তে বলে ফেললেন যে, আমি সন্তানদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে বাসার ডিস লাইন কেটে দিয়েছি। তখন তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক হিসেবে ২৬ হাজার সন্তানতুল্য ছাত্রের জন্য আপনি এভাবে ভাবতে পেরেছেন কি? তিনি মাথা নিচু করে বললেন, না। আসলে এখানেই আমাদের মূল সমস্যা। আমরা অন্যকে নিজেদের করে ভাবতে শিখিনি। যারা অন্যের মেয়ে কিংবা বোনকে দিয়ে আজ মডেলিং, কনসার্ট এবং ফ্যাশন শো করে আনন্দ উপভোগ করছেন তাদের অনেকেই নিজের মেয়ে কিংবা বোনকে দিয়ে এমনটি করতে রাজি হবেন কি?

অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র বাইরের শত্রুর ব্যাপারে যত সহজ কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমরা দু' ধরনের সেবাদাস দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম দলটি সেকালের কথিত ব্রেইন চাইল্ড, যারা চিন্তায় পাশ্চাত্যবাদী আর দেহে বাংলাদেশী। আরেক দল, পরাক্রমশালী প্রতিবেশীর। দ্বিতীয় আজ্ঞাবহ দলটিই আমাদের জন্য বিপজ্জনক। ভারতীয় আধিপত্যবাদের এসব পরগাছা আমাদের জাতীয়তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সব সময় বিভ্রান্তি ছড়াই। এজন্য বলা হয়, আমরা ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পেলেও তাদের চিন্তার কবল থেকে রেহাই পাইনি। তাদের আনন্দের বর্ণনা এভাবে- "We must at present do our best from a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indians in blood and colour, but in English in tastes, in options in morals and intellect." অর্থাৎ, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করছিল তাদের সাথে শাসক ইংরেজদের মধ্যে দূতের কাজ করা এবং রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় হলেও মেজাজে, চিন্তাভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে যাবে-এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করাই ছিল তাদের এই নতুন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

আজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের গোটা জাতিকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ছায়াছবি, ভারতীয় বই ও পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, এনজিও, সাহিত্য, অশ্লীল ম্যাগাজিন ও কার্ড, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

এসব অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ করা আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। এ দাবি পূরণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বুঝতে হবে আমাদের লালিত, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতিকে। আর বাংলার মানুষের প্রত্যয় হোক আগ্রাসী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষসহ নানাবিধ অপরাধমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য শুধু কয়েকজন দুর্নীতিবাজকে জেলে ঢুকালেই হবে না, এজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। আগামী দিনের দেশ পরিচালক তথা বর্তমান ছাত্রসমাজকে নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামী অনুভূতি জাগ্রত করে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাল্টাতে হবে আমাদের অপসাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা। বর্জন করতে হবে বিজাতীয় সংস্কৃতি। এখনই সময় এসবের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেয়া এবং আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার গোড়াপত্তন করার। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকেই সমান ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশ হোক আগ্রাসী সংস্কৃতির দখলমুক্ত সুখী-সুন্দর-সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির ধারক-বাহক।

মে, ২০০০

সফল নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি

গ্যাটকো দুর্নীতি মামলায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার করা হবে- এমন খবর ছিল "টক অব দ্য কান্ট্রি"। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী হাইকোর্টে জামিনের জন্য গেলেন কিন্তু আদালত তাকে জামিন না দিয়ে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে তা শুনানির জন্য ২০ মে তারিখ ধার্য করেন, কিন্তু সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৮ মে রাতেই তাকে গ্রেফতারের উদ্যোগ গ্রহণ করে আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। রাত আনুমানিক ১০টা থেকে বলা যায় উদ্যোগ চলতে থাকে গ্রেফতার প্রক্রিয়ার- কিন্তু হাজারো বাধার পাহাড় ভেদ করে হাজার হাজার নেতাকর্মী অবস্থান নেয় প্রাণপ্রিয় নেতার বাড়ির সামনে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর চোখের পানি আর বৃষ্টির পানি সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল। এ যেন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

মন খুব ভাল নেই, মোবাইল ফোনে রিং বেজে উঠল, রিসিভ করে শুধু কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলাম, কে বলছেন? উত্তর এল, আমাকে চিনবেন না, সাঁথিয়া থেকে, আহারে! আমাদের নিজামী ভাইকে কেন গ্রেফতার করলো? আহারে! যারা আমাদের ভাইকে গ্রেফতার করলো আল্লাহ তুমি তাদের বিচার কর। বাকরুদ্ধ অনেক না বলা কথা আর বলতে পারল না। বেচারা কাঁদতে কাঁদতে ফোনটি রেখে দিল। রাত ১টা ৪৬ মিনিটে আমেরিকা থেকে ফোন করল জাহিদ। সে বললো, আমাদের এখানে এ খবর শুনে কেউ কাঁদছে, কেউ নামাজ পড়ে, কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে আমীরে জামায়াতের জন্য দোয়া করছে। আমার বিশ্বাস সেদিন কাবার গেলাপ ধরে অনেকে কেঁদেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের চোখের পানি ফিরিয়ে দেবেন না। এ রকম সারা বিশ্ব থেকে অনেক ফোন সেদিন রিসিভ করেছি। জাহিদ পেশায় সাংবাদিক। বললো, আমরা এবার আমেরিকায় যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলব, আপনারা লড়ে যান বিজয় আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ। আমার বিশ্বাস বিশ্বের কোটি কোটি বনি আদমের চোখের পানি, নফল রোজা, দান-সদকা কখনও বৃথা যায়নি, আগামী দিনেও যাবে না।

আল্লাহর দীনের এই বীরপুরুষ গ্রেফতারের সময়ও অটল, অবিচল। হাজার হাজার নেতাকর্মীর আর্তচিৎকার সেদিন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। নেতাকর্মীদের চোখের পানি আর আকাশের পানি একাকার হয়ে গেছে কিন্তু তার

মুখে হিম্মতের স্নিগ্ধ হাসি। এ যেন ফেরেশতাতুল্য একজন মানুষ যার চেহারায় ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য, সাহসী নির্ভীকতা- যেন মর্দে মুজাহিদের চিহ্ন। হাজারো বিপদ যেন অনেক চেনা পথের মতো বহমান। সামান্যও যেন বিচলিত নন তিনি, মনে হয় চলে যাচ্ছেন চিরচেনা কোন জায়গায়। তাইতো কবি বলেছেন–

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দেবে কোন বলিদান।"

মাওলানা মওদূদীর প্রতিচ্ছবি মাওলানা নিজামী

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে যারা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অধ্যাপক গোলাম আযম এবং এর পরই স্থান করে নিয়েছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ঈমান-ইলম, আমল, সংগঠন পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যেন মাওলানা মওদূদীর-ই প্রতিচ্ছবি ধীশক্তিসম্পন্ন। স্থির চিন্তার এই ব্যক্তিকে বিশ্ববাসী দেখেছে পল্টনের ২৮ অক্টোবর রক্তাক্ত প্রান্তরে। এমনই এক দিনে মাওলানা মওদূদীর সম্মেলনে যখন হামলা চালানো হয়েছিল। মাওলানা মওদূদীকে লক্ষ্য করে যখন মুহুর্মুহু গুলি করা হচ্ছিল তখন সবাই বসে পড়ল। আর চিৎকার করে সবাই বলল, মাওলানা বসুন বসুন! সেদিন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমিই যদি বসে যাই তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তার আল্লাহর প্রতি অগাধ তাওয়াক্কুল সেদিন সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল। ঠিক তেমনি ২৮শে অক্টোবর ১৪ দলের সন্ত্রাসীদের মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ স্তব্ধ করতে পারেনি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে। অসংখ্য ভাইয়ের শাহাদাত, আহত, রক্তাক্ত জমিনে দাঁড়িয়েও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ছিল। ছিলেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলে ভরপুর। তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল এবং অবিচল। এ যেন মাওলানা মওদূদীরই প্রতিচ্ছবি।

এই হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। অধিকারবঞ্চিত গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। আল্লাহর জমিনে দীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ঐক্যবদ্ধ তৌহিদী জনতার হৃদয়ের স্পন্দন, ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার। এ যেন সত্যের এক জাজ্বল্যমান উপমা। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে গণমানুষের কল্যাণে নিবেদিত এই মহান ব্যক্তিত্ব মুক্তিকামী ও মজলুম জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশের

মর্যাদাকে বহির্বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল ও উন্নত করার ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে খচিত। আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি স্বনির্ভর, সুখী-সমৃদ্ধ, ও মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী । মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই বিশাল সংগঠনের মহান আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে দেশের ইতিহাসে সৃষ্টি করেছেন এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। বস্তুত মাওলানা নিজামী এ সময়ে বাংলাদেশ সরকারের যথাক্রমে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব পালনকালে তিনি যে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল ও সার্থক করে তুলতে যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা এক অনন্য ও অনুসরণীয় অধ্যায়।

অথচ তার মতো একজন সর্বজন স্বীকৃত সৎ মানুষকে তত্ত্বধায়ক সরকার দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে প্রশ্নবিদ্ধতার শেষ পেরেকটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। মাওলানা নিজামী, মুজাহিদসহ সৎ এমপি-মন্ত্রী-রাজনৈতিক নেতাদের সততার স্বীকৃতি দিলে সরকারের এই অভিযান সার্থক হতো। দেশের জনগণ সরকারকে অভিনন্দন জানাতো। কিন্তু তা না হয়ে সরকারের এই অভিযান এখন নেতৃত্বশূন্য করার অভিযানে পরিণত হয়েছে।

তিনি ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত অমায়িক ও খোদাভীরু। যাবতীয় অন্যায়, জুলুম ও খোদাদ্রোহিতার বিরুদ্ধে আপসহীন এই সংগ্রামীনেতা ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে পাবনার সাঁথিয়া-বেড়া এলাকার গণমানুষের প্রতিনিধি তথা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে এই আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে ৩৭ হাজার ৮৬৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করেন।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মনমতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম লুৎফর রহমান খান একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই মাওলানা নিজামী ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠার

সুযোগ লাভ করেন। নিজগ্রাম মনমতপুর প্রাইমারি স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার সূচনা হয়। প্রখর মেধার অধিকারী নিজামী বরাবরই বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৫৫ সালে তিনি দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে প্রথম বিভাগে সমগ্র বোর্ডে ষোলতম স্থান অধিকার করে 'ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায়' ভর্তি হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেধাবী নিজামী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এ-মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের একক সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রসংঘের আকর্ষণীয় কর্মসূচি তাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি একনিষ্ঠভাবে এ-সংগঠনের মাধ্যমে নিজকে আল্লাহর যোগ্য বান্দা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য দীনের কাজে সঁপে দেন।

লেখাপড়া ও সাংগঠনিক কার্যক্রম– উভয় দিকেই তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল পরীক্ষায় ফেকাহ্ শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে কৃতিত্বের সাথে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন।

সহজ সরল জীবনের অধিকারী মাওলানা নিজামী

তিনি কত সহজ সরল জীবনের অধিকারী তা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন তারাই জানেন। এই মহান প্রাণপুরুষ মর্দে মুজাহিদকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। বিগত নির্বাচনের সময় তার গ্রামের বাড়ি সাঁথিয়ায় দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস একান্তে সাংগঠনিক নির্দেশে সাঁথিয়ায় অবস্থান করছিলাম। নির্বাচন অত্যাসন্ন, আমাদের অনুরোধ আমীরে জামায়াত যাতে করে বেশি সময় এলাকায় থাকেন। আমাদের এই অনুরোধ যখন জোরালো তখন জানতে পারলাম শহরে থাকার মতো নিজের বাড়ি নেই। নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াত অফিসের সামনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে, যা শেষ করতে আরো কয়েকদিন সময় লাগবে। থানা আমীরের মুখে এ কথা শুনে নিজের অজান্তেই চোখে পানি গড়িয়ে পড়ল। এটা কি কল্পনা করা যায়? সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী, যার স্বাক্ষরে হাজার হাজার কোটি টাকা পাস হয় কিন্তু তার থাকার জায়গাটুকুও নেই। এতো খোলাফায়ে রাশেদার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি!

রাসূলের (সা) জীবনের অনুকরণে একনিষ্ঠ

চলাফেরা, পোশাক, কথাবার্তা, পানাহার, ওঠাবসা, আবেগ অনুভূতি, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের (সা) জীবনের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেন। মাওলানা সবসময় মুচকি হাসেন, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের (সা) জীবনের অনুকরণে একনিষ্ঠ।

সততা ও নিষ্ঠার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ব্যক্তিগত জীবনে একান্তই সৎ, নিজের পরিচালিত দু'টি মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার পরিচালিত সংগঠনকে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ কথা হয়তো মন্ত্রণালয়ের অনেক সচিব এবং বিভিন্ন জেলার ডিসিও জানেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রী থাকাকালীন ডিসি অফিসে খাবার ব্যাপক সুযোগ সুবিধা খুব কমই গ্রহণ করেছেন। এটি ছিল এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব থাকাকালীন যখন মাওলানা নিজামীর মন্ত্রণালয় পরিবর্তন হচ্ছে- তিনি বিদায়ী বক্তব্যে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আমার দীর্ঘ দায়িত্ব পালনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মতো এমন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, আন্তরিক মানুষ আর পাইনি। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সচিবের মুখে মন্ত্রী সম্পর্কে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দলীয় অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যন্ত তিনি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেন না।

ইবাদত-বন্দেগিতে মাওলানা

আল্লাহর বন্দেগি যদিও একান্তই বান্দাহ ও মনিবের সাথে সম্পর্কিত, তবুও আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের বাহ্যিকতাই অনেক কিছুর সাক্ষ্য বহন করে। এই জন্য আল্লাহতায়ালা বান্দাহর গুণাবলি কুরআনে পাকে বর্ণনা করেছেন : 'তারা মুসলমান তথা মুত্তাকি, তারাই মুহসীন।'

মাওলানা একজন তাহাজ্জুদ-গুজার মানুষ ছিলেন। তাঁর ইমামতিতে অনেকদিন নামাজ আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন হৃদয়ে জোয়ার সৃষ্টি হতো। কুরআনের অনেক আয়াত পড়ার সময় তিনি কেঁদে ফেলতেন। এই আল্লাহপ্রেমিক মানুষকে আজ কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকিয়ে রাখা যাবে কিন্তু এই মজলুমের ফরিয়াদ আর চোখের পানিতো বন্ধ করা যাবে না। আরশের মালিকের সাথে বিনিদ্র রজনীর চোখের পানিতে একদিন জোয়ার আসবেই। ৬৫ বছরের এই মানুষের জন্য এখন কারাবাস অবশ্যই কঠিন, যিনি ডাক্তারি থেরাপি গ্রহণ করতেন। গভীর রাতে উঠে হয়তো বাসার মতো সকল সুযোগ সুবিধা পাবেন না। কিন্তু গভীর রাতে জায়নামাযে

দাঁড়ানো ব্যক্তির ফরিয়াদ বৃথা যাবে না। এই পৃথিবীর সকল বিচারকের বিচারক আহকামুল হাকেমিন আদালতের যদি মঞ্জুর হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর কোন মানুষই তা ঠেকাতে পারবে না। আরশের মালিক যদি মাওলানা নিজামীকে মর্যাদা দিতে চান পৃথিবীর কোনও শক্তিও তা পরাভূত করতে পারবে না।

ইসলামী ছাত্রআন্দোলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

১৯৬১ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তিনি ছাত্রআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে তদানীন্তন আইয়ুব সরকার ছাত্রসংঘের ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা সরকারি ষড়যন্ত্র ও দমননীতির কাছে মাথা নত না করে COP, DAC, PDM-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৬২-৬৬ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে মাওলানা নিজামীর ওপর পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সময় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সংঘাতমুখর। পরপর তিন বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি (নাজেমে আ'লা) নির্বাচিত হন। পর পর দু'বছর তিনি এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা-আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ছাত্রদের উদ্যোগে শিক্ষাসপ্তাহ পালিত হয়। এ উপলক্ষে 'শিক্ষা সমস্যা-শিক্ষাসঙ্কট' ও 'শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন' সংক্রান্ত দু'টি পুস্তিকা বের হয়। নিজামীর নেতৃত্বাধীন গঠনমূলক এ আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায়, ছাত্রসংঘ ছাত্র-জনতার কাছে ক্রমে আরো প্রিয় সংগঠনে পরিণত হতে থাকে। আইয়ুববিরোধী এই আন্দোলন চলাকালে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী আসাদ নিহত হয়। আদর্শিক দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মাওলানা নিজামী আসাদের জানাযায় উপস্থিত হন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাঁকে ইমামতি করার অনুরোধ জানালে, তিনি জানাযায় ইমামতি করেন। এ থেকে বোঝা যায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা নিজামী ছাত্রনেতা হিসেবে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন।

বুদ্ধিদীপ্ত পথচলা

সকল ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার ও জুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন পাহাড় সমান ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। বুদ্ধিদীপ্ত পথচলা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলতা ছিল তার একমাত্র পাথেয়। সে জন্য ২৮শে অক্টোবর, ২০০৬ এর রক্তাক্ত ময়দানেও তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণের কথাই বলেছিলেন, যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

ঐতিহাসিক ভাষণে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

বক্তৃতাও একটি জাদু। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দিয়েছেন সেই নিয়ামক শক্তি, যার বক্তৃতার ভাষা মাধুর্যপূর্ণ ও শালীন কিন্তু বজ্রকণ্ঠ। আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিবিদ কুরুচিপূর্ণ ভাষা ও অশালীন উক্তিতে রাজনৈতিক যুক্তিপূর্ণ অঙ্গনকে কলুষিত করেছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম মাওলানা নিজামী। তার বক্তৃতার গাঁথুনি এতই সুন্দর যে তা edit না করেই বই বের করা সম্ভব। তাই মাওলনা মওদূদীর মতো তার অনেক বক্তব্য বই আকারে এখন বাজারে।

গণআন্দোলন ও কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থার প্রবর্তনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, এ আন্দোলনে মাওলানা নিজামী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ফলে একাধিকবার তিনি স্বৈরশাসকের আক্রোশের শিকার হন। তাঁর সাহসী নেতৃত্বের কারণে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ১৯৯০ সালে জাতি অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত ফর্মুলা অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে সংসদে মাওলানা নিজামী বিল উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদের ভেতর ও বাইরে জামায়াতে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান

সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর সংগ্রামী ভূমিকা জাতির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ধ্বংস, পৌত্তলিকতার প্রচলন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত, কুখ্যাত জননিরাপত্তা আইনের ছদ্মাবরণে বিরোধী দল দমন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখণ্ডতাবিরোধী পার্বত্য কালোচুক্তি, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নামে প্রহসন। সর্বোপরি দেশ-জাতিকে ধ্বংসের বহুমুখী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

সিপাহসালার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি সংগঠনের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বছর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০০ সালের ১৯ নভেম্বর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে তৃতীয়বারের মতো মাওলানা নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি এই মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

দুর্নীতিমুক্ত দেশ ও জাতি গঠনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর অবদান

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছাত্রজীবন থেকে ছাত্ররাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যেমনি ভূমিকা পালন করে আসছেন তেমনি তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনেও তিনি দেশ ও জাতি গঠনে অনন্য অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। বিগত দিনের চারদলীয়

জোট সরকারের সফলতার পেছনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ সর্বজনস্বীকৃত।

উদার রাজনীতিবিদ

রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক আদর্শের মূর্তপ্রতীক। আদর্শিক মতপার্থক্য থাকলেও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সকলের নিকট একজন উদার রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রতিহিংসা, বিদ্বেষপূর্ণ ও অশ্লীল ভাষা যখন রাজনীতির বাহন হতে শুরু করেছে ঠিক তেমনি প্রেক্ষাপটেও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদার রাজনীতির স্বাক্ষর রেখেছেন। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গ্রেফতারের একদিন আগেও সংবাদ সম্মেলনে কারাবন্দী সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর মুক্তির দাবি করেছেন জোরালোভাবে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে উদারতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন যা দেশের জনগণের কাছে প্রত্যাশিত ও প্রশংসনীয়।

ছাত্রসমাজের প্রাণপ্রিয় নেতা

ছাত্রজীবনে তিনি যেমনি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি ছাত্রসমাজকে মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠন করার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল অনুকরণীয়। তিনি বরাবরই ছাত্রসমাজকে লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজকে গড়ার তাগিদ প্রদান করতেন। তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাস ও হানাহানির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ভূমিকা রেখেছেন। এভাবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছাত্রসমাজের প্রাণপ্রিয় মানুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি ছিলেন এ দেশের ছাত্রসমাজেরই একজন। নিজামীই একমাত্র বলিষ্ঠ নেতা, বাংলাদেশের ইতিহাসে যিনি সংসদে দাঁড়িয়ে "শিবির কারো ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করে না, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে না" বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। সেদিন কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। ইসলামী ছাত্রশিবির বরাবরই অপপ্রচারের শিকার। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রাবি শিক্ষক ড. এস তাহের হত্যা মামলা থেকে বিজ্ঞ আদালতের রায়ে রাবি শিবির সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীর বেকসুর খালাস পাওয়া।

চারদলীয় ঐক্যজোটের শীর্ষনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

১৯৯৬ সালে জাতির ঘাড়ে চেপে বসা আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

চারদলীয় ঐক্যজোট ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয় লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করে চারদলীয় ঐক্য অটুট রাখা ও শক্তিশালী করার পেছনে মাওলানা নিজামীর অপরিসীম ধৈর্য ও ত্যাগের কথা সকলেরই জানা। চারদলীয় ঐক্যজোটের শীর্ষনেতা হিসেবে মাওলানা নিজামীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি জনগণের রয়েছে বিপুল আস্থা।

জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯১ সালে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) নির্বাচনী এলাকা থেকে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়ে তিনি একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে দেশবাসীর কাছে খ্যাতি লাভ করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তিনি পার্লামেন্টে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, তথ্য-যুক্তি ও সময়োপযোগী বক্তব্য পার্লামেন্টে সকলের সমর্থন লাভ করে। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি সংসদের চারটি পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য ছিলেন। এগুলো হলো– কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, পিটিশন কমিটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি।

মাওলানা নিজামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি প্রতিষ্ঠানও বটে। এদেশের ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কারণে ইসলামবিরোধী অপশক্তি তাঁর বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক ডাকা হয়। আমন্ত্রিত হয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই বৈঠকে উপস্থিত হন। এ-সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে তার ওপর নগ্নহামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং দীর্ঘ সময় চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

বিগত আওয়ামী দুঃশাসনামলে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট নির্দেশে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আওয়ামী-পুলিশ-বাহিনী সরাসরি তার মতো প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের ওপর লাঠিচার্জ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। কিন্তু কোন হুমকি, আঘাত ও আক্রমণ কখনও তাকে বিচলিত করতে পারেনি। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যার একমাত্র কাম্য; কোন বাধা, কোন ষড়যন্ত্রই তার উদ্যমকে নস্যাৎ করতে পারে না।

কৃষিমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়ে চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করে। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আওয়ামী দুঃশাসনে দুর্নীতিগ্রস্ত এই মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশ ও জাতির সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেন। খাদ্যশস্য উৎপাদন ৭ লাখ মেট্রিক টন বেশি, বন্যা ও টর্নেডোতে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ১ লাখ ২৪ হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পরও উক্ত অর্থবছরে বোরো উৎপাদন ২০০০-২০০১ অর্থবছর থেকে ৭ লাখ মেট্রিক টন বেশি হয়েছিল। "চাষির বাড়ি বাগান বাড়ি" মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর যুগান্তকারী কর্মসূচি। বিএডিসি'র বীজ উইং শক্তিশালীকরণ, কৃষিবিদ-কৃষিবিজ্ঞানীদের পদোন্নতি মাঠপর্যায়ে ব্যাপক সফর, ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষের সূচনা, ব্লক সুপারভাইজারের পদবি পরিবর্তন, মাটির গুণগতমান পরীক্ষা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভুট্টা ও পাটের চাষ বৃদ্ধি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার সফল প্রণেতা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন এবং এই মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক সফলতার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ভেঙেপড়া বিতর্কিত শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত ও গতিশীল করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতোই মাওলানা নিজামী দেশের কল্যাণে শিল্প মন্ত্রণালয়কে গতিশীল ও যুগপোযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন, এসএমই

নীতি-কৌশল গ্রহণ, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য পৃথক এসএমই নীতি-কৌশল ২০০৫ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.৪৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫.৪৮ ভাগ, যা ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে শতকরা ১০.৪৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহ, দু'টি নতুন সার কারখানা স্থাপন, বন্ধ শিল্প চালু, কর্ণফুলী পেপার মিলের (কেপিএম) বন্ধকৃত কস্টিক ক্লোরিন প্লান্ট, খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস, রংপুর সুগার মিলস্ পুনরায় চালু করা হয়েছে।

শিল্প নগরী স্থাপন, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ উন্নয়নের জন্য হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পকে সাভারে, নতুন স্থাপিত চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা। এ-ছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ও অটোমোবাইল ওয়ার্কসপের জন্য পৃথক শিল্পনগরী গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

চিনি শিল্পে প্রায় ৭০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন :বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) দীর্ঘ ১৭ বছরের মধ্যে ২০০৫-২০০৬ আখ মাড়াই মৌসুমে দ্বিতীয় বারের মতো প্রায় ৭০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১ লাখ ৩২ হাজার ৩৭৫ জন লোকের কর্মসংস্থান : বিসিক ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র শিল্পে ৯০ হাজার ২৯৭ জন এবং কুটির শিল্পে ৪২ হাজার জনসহ মোট ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৭৫ জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে রফতানি আয় বৃদ্ধি : ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বিসিক শিল্প ইউনিটগুলোতে ১১ হাজার ৩৯ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং এর মধ্যে রফতানি হয়েছে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকার পণ্য।

লবণ উৎপাদনে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড : দেশে মোট সাড়ে ১১ লাখ মেট্রিক টন লবণের চাহিদা থাকলেও বিগত ২০০৫-২০০৬ উৎপাদন মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১৫ লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে, যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

বিএসটিআই'র আধুনিকায়ন একটি সর্বমহল প্রশংসিত উদ্যোগ : পণ্যের নকল ও ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিএসটিআই'র আওতায় দেশব্যাপী ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে, যা দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে সমাদৃত

হয়েছে। 'বিএসটিআই'কে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ফুড ফর্টিফিকেশন অ্যালায়েন্স গঠন : আটা ও ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুড ফর্টিফিকেশন অ্যালায়েন্স গঠন করা হয়েছে।

ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড গঠন: পণ্যের নকল ও ভেজাল প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন শিল্প ও সেবাসামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন মানপ্রণয়ন ও স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থার উৎপাদন : লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম বিগত ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি), বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি) এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে অতিরিক্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামী

চারদলীয় ঐক্যজোট যখন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড শক্তিশালী করার কাজে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, সন্ত্রাস দমনে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলছিল, ঠিক তখন ইসলাম ও দেশবিরোধী শক্তির ক্রীড়নক একটি গোষ্ঠী দেশব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বোমা হামলা চলায়। অথচ ইসলাম কখনোই কোনরূপ সহিংসতার পথকে সমর্থন করে না। কিন্তু এই গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ইসলামের বদনাম রটানোর জন্য এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে থামিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ হামলা পরিচালনা করে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে জামায়াতে ইসলামী ও এর আমীর মাওলানা নিজামীর সোচ্চার ভূমিকার কারণে ইসলামের নামে বোমা হামলাকারী এসব ঘাতকের মুখোশ জাতির সামনে খুলে যায়।

ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামীর কঠোর অবস্থান

বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা কর্তৃক দু'টি স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর আক্রমণ ও দখলদারি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা নিজামী পালন করেন সোচ্চার ভূমিকা। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাথে ন্যক্কারজনক আচরণ,

লেবাননে বর্বরোচিত ইসরাইলি হামলাসহ ইহুদিবাদীদের সব ধরনের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মাওলানা নিজামী সংসদে, রাজপথে ও মিডিয়া জগতে নিয়মিত বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

মাওলানা নিজামী ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ, গ্রেফতার, অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘ, ওআইসিসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং শান্তি কামী বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

জার্মান অধ্যাপক হেন্স কিপেনবার্গ 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এক যুদ্ধবাজ ও ইসলামকে জঙ্গি বা রণমুখী ধর্ম' অভিহিত করার প্রতিবাদে মাওলানা নিজামী বলেন, 'ইসলাম সন্ত্রাসবাদী ধর্ম নয়, এরূপ কোন সার্টিফিকেট পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে নেয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। কেননা বিশ্বে এরই মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

থাইল্যান্ডে ৮৪ জন মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে মাওলানা নিজামী বলেন, 'এ ঘটনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও জাতিসংঘ সনদ লঙ্ঘন করা হয়েছে। তিনি থাইল্যান্ডের মুসলমানদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ, অত্যাচার-নির্যাতন, জুলুম ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রসঙ্গে ৯ মার্চ ২০০৩ এর ঐতিহাসিক বক্তব্যে মাওলানা নিজামী বলেন, 'আমেরিকা কর্তৃক ইরাকে আক্রমণ মূলত এক অন্যায় যুদ্ধ। এক পরাশক্তির এই অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করে তুলেছে গোটা বিশ্বকে।'

ডেনমার্কে মহানবী (সা) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে জাতীয় সংসদে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এর ঐতিহাসিক বক্তব্যে মাওলানা নিজামী বলেন, রাসূলে পাক (সা)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে আমরা সকলেই এক হয়েছি। এই মহান সংসদে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরেছি। এটা একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, ব্যঙ্গচিত্র ছাপার পেছনে যে শক্তি রয়েছে বিশ্বব্যাপী আজ জঙ্গিবাদ অথবা তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের পেছনেও ঐ একই শক্তি সক্রিয় রয়েছে।

বিশ্বরাজনীতিতে মাওলানা নিজামী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে বিশ্বরাজনীতির সাথে মাওলানা নিজামীর রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নানা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে মাওলানা নিজামীর ভূমিকা প্রসংশিত হয়েছে। ২০০২ সালের ২৭ মার্চ মুসলিম দুনিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভির নেতৃত্বে মধ্যপ্রাচ্যের দশজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২০০২-এর ১১ এপ্রিল মাওলানা নিজামী রাবেতা আলম আল ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সৌদি গেজেট পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এ সময় মাওলানা নিজামীসহ মুসলিম বিশ্বের ৫২ জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী আরব ও মুসলিম বিশ্বের জনগণের প্রতি ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আহবান জানান।

২০০৩ সালের ১৫-১৭ অক্টোবর চীনে অনুষ্ঠিত Sustained Elimination of Iodine Deficiency Disorder শীর্ষক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

২০০৬ সালে মাওলানা নিজামী ইংল্যান্ডের শীর্ষ বৈদেশিক ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণী বিশেষজ্ঞ ফোরাম চেথম হাউজের আমন্ত্রণে 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ : জামায়াতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে তিনি এ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, এ বৈঠকে ব্রিটেনের বিশিষ্ট নীতিনির্ধারক বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা নিজামী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। আরো উল্লেখ্য যে, চেথম হাউজ ব্রিটেনের অন্যতম শীর্ষ নীতিনির্ধারণী বিশেষজ্ঞ ফোরাম, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রেখে থাকেন। মাওলানা নিজামী প্রথম বাংলাদেশী নেতা, যিনি চেথম হাউজের আমন্ত্রণে সেখানে বক্তব্য রাখেন। ২০০৬ সালে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত রাবেতা আলম আল ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওলামা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। এ ছাড়াও বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ও বহু আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মাওলানা নিজামী পালন করেন বলিষ্ঠ ভূমিকা।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

মুসলিম বিশ্বসহ বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা নিজামীর রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মাওলানা নিজামী বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের নেতৃবৃন্দের সাথে এবং এসব ফোরামের কল্যাণমুখী কর্মসূচির সাথে যুক্ত থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মাওলানা নিজামী

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা, টিভি মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মাওলানা নিজামীর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ইস্যুসমূহ ছাড়াও মাওলানা নিজামীর বিভিন্ন বক্তব্য, বিবৃতি এসব সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে মাওলানা নিজামীকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে মাওলানা নিজামীর অসাধারণ দেশপ্রেম, নীতিনিষ্ঠা ও কিংবদন্তিতুল্য সততা আজ গণমানুষের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

শিক্ষার ইসলামীকরণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাওলানা নিজামী

দেশব্যাপী প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাওলানা নিজামী পালন করেন আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা। কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও মান প্রদান এবং ফাজিল-কামিলের মান প্রদানের মতো চারদলীয় জোট সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে মাওলানা নিজামীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলেরই জানা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে মাওলানা নিজামী

মাওলানা নিজামী শৈশবকাল থেকে কল্যাণমুখী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ধারার সাথে যুক্ত। জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রসহ বহু বড় বড় সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে তিনি অবদান রেখে আসছেন। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিজেও একজন বড় মাপের সাহিত্যিক। গদ্যশিল্পে তার রয়েছে ব্যতিক্রমী পারঙ্গমতা।

লেখক ও চিন্তাবিদ মাওলানা নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংগঠনের দায়িত্ব পালন ও রাজনৈতিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইসলামী সাহিত্য রচনা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। বাল্যকাল থেকেই লেখালেখির প্রতি মাওলানা নিজামীর ঝোঁক ছিল। তিনি মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পাবনা থেকে প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অভিযানে' তার গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হতো। তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদের খেলাঘর, দৈনিক ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে নিয়মিত লিখতেন। দৈনিক মিল্লাতের কিশোর কাফেলায় তার লেখা ছাপা হতো। তার সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রজীবনেই তিনি একজন লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি দৈনিক সংগ্রামেও দীর্ঘদিন লেখালেখি করেছেন। ছাত্রজীবন শেষে ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়েও তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। মাওলানা নিজামীর এসব লেখায় মৌলিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। এ ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন ভাষণ-অভিভাষণেও রয়েছে চিন্তা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে মাওলানা নিজামীর ভূমিকা

মাওলানা নিজামী সংগঠন পরিচালনা, রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব প্রদান ও লেখালেখির পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বহুসংখ্যক সামাজিক, গবেষণামূলক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত। তিনি এগুলোর অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, আধুনিক প্রকাশনী, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, মাসিক পৃথিবী, মাসিক নতুন কলম, ইংরেজি মাসিক আল-ইসলাম ইত্যাদি। এ ছাড়া বেড়া আল ইসলাম ট্রাস্ট, আল হেরা একাডেমী প্রভৃতির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সাঁথিয়ার ইমাম হোসাইন একাডেমীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল হেরা একাডেমী আজ পাবনা জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

বিদেশে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বিদেশ সফর করেন। এসব সফরে তিনি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, গ্রিস, জার্মানি, চীন, ইতালি, কানাডা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্কসহ প্রায় অর্ধশত দেশ সফর করেন। তিনি বহুবার সৌদি আরব সফর করেন। এর মধ্যে ১৯৮০, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০১ এবং ২০০২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবারই রয়েল গেস্ট হিসেবে মর্যাদা পান।

সব নবী ও রাসূল, সাহাবায়ে আজমাইন জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবী রাসূল (সা) স্বয়ং শিহাবে আবুতালিবে কারাবরণ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) কারাবরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালা হযরত ইউসুফ (আ)-কে মিসরের বাদশা বানিয়েছেন। তাই মুমিনদের ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা করেই আল্লাহতা'য়ালা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ বলেন: "তোমরা ঈমান এনেছ এ কথা বললেই তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে না। বরং পরীক্ষা করা হবে যেমনি পরীক্ষা করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে।"

আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনের সূর্য উদিত হওয়া যেমনি সত্য তেমনি সত্য মাওলানা নিজামীর মুক্তি। বিশ্ববাসী সে সোনালী দিনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমান।

মে, ২০০৮

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক মুহাম্মদ (সা)

হযরত মুহাম্মদ (সা) এসেছিলেন মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে। যার আগমনে মুগ্ধ এ ধরা। অন্ধকার-অমানিশা পেরিয়ে আলোক রশ্মি প্রস্ফুটিত, বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জনপদ উৎফুল্ল তাঁর ছোঁয়ায়। এতে অসভ্য-বর্বর মানুষগুলো হয়ে গেল সভ্য। শত্রু হল আপন বন্ধু। নাঙ্গা তলোয়ার চুম্বন করল রাসূলের পদযুগল। অপরাধী স্বীকৃতি দিল তার পাপের, হয়ে গেল এক বিরাট পরিবর্তন। এখনও ওহী আসেনি এ মানুষটির কাছে, শুধুমাত্র একজন মানুষ হিসেবে হিলফুল ফুযুল গঠন করে আত্মমানবতার সেবায় ব্রত এক সাহসী যোদ্ধা তিনি। এ কর্মের সর্বজন স্বীকৃতির উদাহরণস্বরূপ উপাধি পেলেন আল-আমীন।

মানুষ যখনি বুঝতে পারল তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য একজন সাহসী যোদ্ধা; নিঃস্বার্থ পথিক; লোভ-লালসা মুক্ত অভিযাত্রী, তখনই তারা জীবন বাজি রেখে সে আদর্শের দিকে ছুটে গেল। সে আদর্শের সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত হয়েছে ইসলামের সুমহান পতাকা তলে। এই মহান আদর্শ তাদের অন্তকরণকে করেছে শাণিত। জীবন দিতে হয় পাগলপারা। পার্থিবতা হলো মূল্যহীন। ত্যাগে খুঁজে পেল সুখ। অধিকার রক্ষা করা হলো দায়িত্ব। লোহার আকর্ষণে চুম্বক যেমন একমুখী, ঠিক তেমনি গোটা মানব সভ্যতা মুহাম্মদ (সা) মুখী হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম যে গ্রহণ করলো সে আর ছাড়তে জানলো না, যে বুঝলো সে আর কখনও কেটে পড়ল না। কারণ সেই অসভ্য উচ্ছৃঙ্খল নির্যাতিত বনি আদমগুলো ফিরে পেয়েছে তাদের অধিকার ও মর্যাদা। নারী-পুরুষ, মনিব-ভৃত্য, মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব, আরব-অনারব, বন্দী-স্বাধীন, ছোট-বড়, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, এক কথায় প্রত্যেকেই বুঝে পেয়েছে তাদের স্ব স্ব অধিকার। এই ভাবে কেটে যেতে শুরু করে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। সোনার পরশে মুগ্ধ হলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা)সহ অনেকেই। যারা রাসূলের (সা) ইন্তিকালের পরেও সমাজ এবং সভ্যতার প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের নায্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আজ অবধি মানুষ যতটুকু অধিকার পাচ্ছে, এটি তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। আজ দুর্ভাগ্য এই জাতির যে সমাজে অধিকার সংরক্ষণের চেয়ে হরণকারীর সংখ্যাই বেশি। অথচ আল্লাহ এক মহান দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন- "নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মানবসমাজে ন্যায়-ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' কিন্তু প্রতি বছর সিরাতুন্নবী (সা) আসছে। রাসূল (সা) এর শানে

ওয়াজ-মাহফিল, আলোচনা সভা, জলসে জৌলুস, সিম্পোজিয়াম-সেমিনার এর সংখ্যা মোটেই কম নয়। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী থেকে শুরু করে সমাজের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে এই মহামানবের আদর্শ শুনি বা আলোচনা করি। কিন্তু ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কয়জনই করছি! এই কাজটি করতে গেলেই হতে হয় নিঃস্বার্থ, ত্যাগী; জাগরুক থাকতে হয় অন্তরে সর্বদা খোদাভীতি ও মানবতাবোধ। কিন্তু আমরা তো তার উর্ধ্বে উঠতে পারছিনা। পারছিনা দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, নিজকরণ-এর শিকলমুক্ত হতে। অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার শ্লোগান যতটা না সহজ কিন্তু কাজে বাস্তবায়ন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

আল্লাহকর্তৃক মনোনীত বিচারক

রাসূল (সা) পৃথিবীর কোন মানুষের মনোনীত বিচারক ছিলেন না বরং তিনি স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "(হে নবী!) আমি সত্য সহকারে আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো যুক্তির আলোকে বিচার ফায়সালা করতে পারেন।" (সূরা নিসা :২০৫) "(হে নবী!) বলুন, আমি আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সুরা শু'রা : ১৫)

"অতএব হে নবী, আপনার রবের কসম তারা কখনই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদে আপনাকে বিচারক মানবে এবং আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখেই সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিবে।" (সুরা নিসা : ৬৪)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক ছিলেন। আর বিচারক রেসালাত থেকে আলাদা ছিলনা- তাই রাসূল করীম (সা)কে বিচারক হিসাবে না মানা মুমিনের কাজ নয় বরং তা মুনাফিকের কাজ। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের বলা হয় আল্লাহর নাজিল করা কিতাব ও রাসূলের দিকে এসো, তখন দেখবে যে, মুনাফিকরা তোমার থেকে কেটে পড়েছে।" (সূরা নিসা : ৬১)

বিচারকের দায়িত্ব পালনের নীতিমালা

- বিচারক সব মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করবেন।
- সাক্ষ্য প্রমাণের দায়িত্ব সাধারণত বাদীর ওপরে।

- বিবাদীর যদি কোন প্রকার সাফাই বা প্রমাণ না থাকে তবে তাকে শপথ করতে হবে ।
- মুকাদ্দামা ফয়সালা করার পর বিচারক ইচ্ছে করলে তা পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন ।
- প্রত্যেক মুসলিমের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না ।

আলী (রা) এর অতিরিক্ত নীতিমালাগুলো হলো-

- জটিল কিংবা সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের কখনই মেজাজের ভারসাম্য হরানো উচিত নয় ।
- যখন বিচারক নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন যে প্রদত্ত রায় ভুল হয়েছে তা সংশোধন করা কিংবা সে রায় বদলে দেয়া তাদের পক্ষে মোটেও মর্যাদাহানিকর ভাবা উচিত নয় ।
- বিচারক লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন হতে পারবেন না ।
- বিচারক অবশ্যই যুক্তি প্রমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। মামলাকারীর উপর দীর্ঘ কৈফিয়তে অধৈর্য্য হবেন না। সত্য এবং মিথ্যা উপনীত হবার কাজে অবশ্যই ধীরস্থির হতে হবে ।
- যাদের প্রশংসা হলে আত্মদর্পী হয়ে উঠে, যারা তোষামোদে গলে যায়, চাটুকারীতায় ও প্ররোচনায় বিপথগামী হয় তাদের মধ্যে কেউ বিচারক হওয়া উচিত নয় ।

তিনি (রাসূল) সুস্থ মস্তিষ্কে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, যাতে কোন পক্ষের প্রতি অবিচার না হয় । তিনি বলতেন, 'রাগান্বিত অবস্থায় যেন কোন বিচারক দু'জন বিবাদমানের মধ্যে ফয়সালা না করেন' । (বুখারী)

হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকার- এক প্রকার জান্নাতি আর দু'প্রকার জাহান্নামি । জান্নাতি তিনি যিনি সত্য অবগত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেন । আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যায় ফয়সালা দান করেন বা সত্য না জেনে আন্দাজের উপরে বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তারা উভয়ই জাহান্নামি ।

মুকুটবিহীন সম্রাট

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি শুধু মুসলমানদেরই স্বীকৃত কোন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র পথ প্রদর্শক। স্থান-কাল-বর্ণ-গোত্র কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কেমন; এটা শুধুমাত্র তাকে দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। আর এই নিরক্ষর মহামানবের সম্পর্কে বিশ্বের মহাজ্ঞানীরা যেসব মন্তব্য করেছেন তা আরো বিস্ময়কর।

১৯৭৮ সালে আমেরিকায় 'The Hundred Ranking of the most influential person in history' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ গ্রন্থটির প্রণেতা আমেরিকার M.H. Heart নিজে খ্রিস্টান, তাই হযরত ঈসা (আ) এর নাম সর্বাগ্রে থাকার কথা। কিন্তু তা না করে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন মুহাম্মদ (সা)কে। তার কারণ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, 'He was the only successful on both the religion and secular levels.' তিনিই একমাত্র ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষ উভয় দিক দিয়েই কৃতকার্য।

মাইকেল হার্ট ছিলেন পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় মনীষী। তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকে তাকে এ বলে চিঠি লিখেছিল, মাইকেল তুমি পাগল হলে নাকি যে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা)কে তোমার বইয়ে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছ? উত্তরে মাইকেল হার্ট লিখলেন, 'প্রিয় বন্ধুরা, আসলে আমি পাগল হইনি, যার নাম আমি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছি সমগ্র পৃথিবী তাঁর জন্য পাগল হয়েছে'।

টমাস কার্লাইল মন্তব্য করেন, "The revolution brought by Prophet Muhammad (S.M) was a great spark of fire which withen a twinkly of an eye burnt out all the rubishes of inhumanities and untruth that erected their heads from Delhi of Granada and from earth to sky."

"মহানবী মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল একটি প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত যে অবমানবতা ও অসত্যের আবর্জনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা চোখের নিমিষে পুড়ে ছারখার করে দিল।" জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর "Getting Marred' গ্রন্থে লিখেছেন- "If all the world was to be united under one leader then Muhammad

(S.M) would have been the best fitted man to lead the people of various needs dogmas and ideas to peace and happiness."

"যদি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে কোন নায়কের শাসনাধীনে আনীত হতো, তা একমাত্র মুহাম্মদই (সা) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।"

ঐতিহাসিক ড. গ্রেফটাউলি "Asib Civilization" গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলামের যে উম্মী নবীর ইতিবৃত্ত বহু আশাজনক। তৎকালের কোন বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি, সে উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে তিনি তাঁর আওতায় বশীভূত করেছেন।"

Ernold Twinoby বলেছেন, মুহাম্মদ (সা) ইসলামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ এবং শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিয়েছেন। কোন ধর্মই এর চেয়ে বড় সাফল্য লাভ করতে পারেনি যে সাফল্য মুহাম্মদ (সা) এর ধর্মের ভাগ্যে জুটেছে। আজকের বিশ্ব যার অভাবে অশ্রুপাত করছে সে অভাব কেবলমাত্র মুহাম্মদী সাম্যনীতির মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। মানুষের মধ্যকার বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীগত পার্থক্যকে চূর্ণ করে একমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মূল্যায়ন একমাত্র তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন।

বিচারকের দায়িত্ব পালনের নীতিমালা

ইনসাফভিত্তিক ফায়সালার জন্য প্রয়োজন কতগুলো মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ। সে ক্ষেত্রে রাসূল (সা) উজ্জ্বল ভাস্বর; যিনি ছিলেন আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ও বেইনসাফীর উর্ধ্বে। একদা এক মহিলা চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হলে তার বংশীয় আভিজাত্যের দিকে তাকিয়ে অনেকে আল্লাহর রাসূলের নিকট মহিলার পক্ষে সুপারিশ করলে তিনি ঘোষণা দেন-"আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে তাহলে নির্দ্বিধায় চুরির শাস্তি হিসাবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

বিচারকার্যের মূল ভিত্তি

বিচারকার্য পরিচালনার মূল ভিত্তি ও উপায় উপকরণ হচ্ছে প্রথমত আল কুরআন। এরপর সুন্নাহ এবং সর্বশেষে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ ফয়সালা। "হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, তখন বললেন, কিভাবে তুমি বিচার-আচার করবে?

মু'আয (রা) বললেন, আল কুরআনের ফয়সালা অনুসারে। হুজুর (সা) বললেন, যদি ঐ বিষয়ে আল কুরআনে কোন ফয়সালা খুঁজে না পাও? মু'আয (রা) বললেন, সুন্নাহ দ্বারা। হুজুর (সা) বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, আমার ইজতিহাদ দ্বারা এবং এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা দেখাবো না। এরপর নবী করিম (সা) হযরত মু'আযের বুকে হাত রেখে বললেন, প্রশংসা সেই আল্লাহতায়ালার যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন ক্ষমতা দান করলেন যাতে আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী) নবী করিম (সা) এর বিচার কার্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার করার সময় বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথাবার্তা যথাযথ শুনে এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে ফয়সালা প্রদান করা। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা না করা সম্পর্কে নবী করিম (সা) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহতাআলা একজন বিচারকের সাথে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ তিনি বিচারকার্যে জুলুম অত্যাচারের উর্ধ্বে থাকে, যখন তিনি জুলুম ও বে-ইনসাফী করেন তখনই আল্লাহ তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং শয়তান এসে তার সাথী হয়ে যায়।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

"হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ন্যায়বিচারক কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্ক্ষা করবেন যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে সামান্য খেজুরের ফায়সালাও যদি তাকে পৃথিবীতে না করতে হতো, তবে কতই না ভাল হত।" (মুসনাদে আহমদ)

সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদ মুহাম্মদ (সা)

বিশ্বের কোন মানুষের গড়া বিশ্ববিদ্যালয় বা আইন কলেজ হতে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেননি। বরং পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কথা ও কাজের পার্থক্য করেননি, আর তিনি হলেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ বলেন, "তোমরা এমন কথা বলনা যা নিজে করনা।" (আল কুরআন) রাসূল (সা) বলেন, আমি তোমাদের মাঝে শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। (আল হাদিস) তিনি অসভ্য আরব জাতির মনের আদালতে এমনই বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে মহানবীই প্রথম 'আলআমীন' উপাধিটি লাভ করেন। তখনও তিনি নবুয়্যত প্রাপ্ত হননি, অতি সাধারণ মানুষ বেশেই সকল মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় ন্যায়বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এই কথা সত্য যে, তিনি যদি নবী নাও হতেন তাহলেও তিনি পৃথিবীর

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন অনুকরণীয় মানব। তখন যদিও তাঁর কাছে আপন কোন আদর্শ ছিলনা। আর নবুয়্যতের পরবর্তী এই মানুষটিই বিশ্বের দরবারে মহান বিচারক হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়েছেন। তিনি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতিটি অধ্যায়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মহানবী বলেন- ৬৫ বছরের নফল ইবাদত অপেক্ষা একটি ন্যায়বিচার শ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (সা)

মহানবী (সা) ২৪ বছরের নবুয়্যতী জিন্দেগীতে অনেক যুদ্ধ করেছেন। ২৭টিতে তিনি সরাসরি সেনানায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এসকল যুদ্ধের প্রত্যেকটি করেছেন মানবতার কল্যাণে। তায়েফের ময়দানের ঘটনাসহ শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর জীবনালক্ষে খুঁজে পাই। কাফেরদের পাথরের আঘাতে তিনি যখন রক্তাক্ত হলেন, সেই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আ) এসে কাফেরদের ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। এই মহামানবের মুখ থেকে তখনও বের হলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, বরং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, "তারা ধ্বংস হলে আমি ইসলামের দাওয়াত কাদের কাছে পৌঁছাবো?"

জীবনের কঠিন মুহূর্ত হল যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে তিনি ছিলেন মানবতার কল্যাণে মগ্ন। চিন্তার মূলে ছিল মানবতাবোধ। হিংসা-বিদ্বেষ, কোন কিছুই তাকে উত্তেজিত করতে পারেনি। আধিপত্য বিস্তার, রাজ্য দখল তাঁর মূলনীতি ছিল না। দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জনগণকে অত্যাচার, নির্যাতন থেকে বাঁচানোই ছিল তাঁর পেরেশানী। সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল 'কোন বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না। মালে গণীমত আত্মসাৎ করবে না।' মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নির্দেশ দেন- 'আহত ব্যক্তির উপর হামলা চালাবে না, পলায়নরত ব্যক্তির পিছু ছুটবে না, যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে তাকে কিছু বলবেনা।' তিনি আরও বলেন, 'সন্ন্যাসীদের কষ্ট দিবেনা এবং উপাসনালয় ভাঙবেনা, ফলবান গাছ ও ফসল নষ্ট করবেনা, অযথা পশু হত্যা করবেনা।' যারা আজকে এই অভিযোগ তোলে যে ইসলাম থেকে রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়; সামগ্রিকভাবে রাসূল (সা) এর জীবনকে পর্যালোচনা করলে তাদের এই অভিযোগ ধোপে টেকেনা। বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত (খায়বারসহ) মোট পাঁচটি বড় আকারের যুদ্ধ হয়েছে। রাসূল (সা) শিক্ষা, প্রচার, গঠন ও

সংস্কারমূলক কাজে মোট ২৩ বছর সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যে সবকটা যুদ্ধে সর্বমোট ১৫ হাজারের চেয়ে বেশি লোক রাসূল (সা) এর মোকাবিলায় আসেনি। তার মধ্যে মাত্র ৭৫৯ জনের জীবনকে পথ থেকে সরানোর মাধ্যমে আরবের লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ শুধরে গেছে। এত অল্প সময়ে আরবের ন্যায় মরুভূমিকে মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে চরম উচ্ছৃঙ্খল, হিংসা, দাঙ্গাবাজ মানুষখেকো গোত্র ও ব্যক্তিরবর্গকে একটি নৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত করা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদের সমাজে আজ যারা উদার গণতন্ত্র আর মানবতাবোধের বুলি ছড়ান, তারাই বিভিন্ন খোড়া অজুহাতে বছরের পর বছর আফগান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনিয়া ও ভারতে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। অথচ অতর্কিত আক্রমণ, আগুনে পোড়ানো, নির্যাতনপূর্বক হত্যা, লুটতরাজ, সম্পদ নষ্ট, লাশ বিকৃতিকরণকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ছোট বড় সকল যুদ্ধের নিহত সংখ্যা হাজারের বেশি হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহায়েতই কম। অথচ এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ২৫০ কোটি মানুষের মধ্যে বণ্টন করলে প্রত্যেকে ৩০ হাজার করে টাকা পেতো। এ যুদ্ধে ৬ কোটি লোক নিহত হয়। হিরোশিমায় এটম বোমার বিস্ফোরণে ১০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বলেছিলেন, যদি যিশুখ্রিষ্ট এই পৃথিবীতে আবার আগমন করতেন তবে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারতেন না। এজন্য একজন ইংরেজ কবি বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে বলেছেন- Falcon can't hear the falconer. তাহলে এ কথা সত্য যে, রাসূল (সা) এর যুদ্ধনীতিও ছিল মানবতার কল্যাণে। কোন ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও কোন বেইনসাফি তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ গোটা বিশ্বের যুদ্ধনীতি আজ এর বিপরীত।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

রাসূল (সা) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সংরক্ষণে ছিলেন এক অপোষহীন যোদ্ধা। আর আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশই ছিল তাঁর মানদণ্ড। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা দুঃপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করনা।"

(নিসা: ১৩৫) তিনি আরও বলেন, "বিচারে কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করোনা।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক বিশ্বের ভিত নির্মাণ করেছেন, যার প্রমাণ- একদা একজন ইহুদি আল্লাহর রাসূলের (সা) কাছে একজন সাহাবীর ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি অবৈধভাবে সাহাবীর পক্ষে রায় না দিয়ে ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন। তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি অমুসলিম নাগরিকের উপর অত্যাচার করবে, অথবা তার অধিকার হরণ করবে অথবা তার সম্মতি ব্যতীত জোরপূর্বক কোন জিনিস ছিনিয়ে নিবে, আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে অমুসলিমের পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়াবো।" (আবু দাঊদ) তিনি ঘোষণা করেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে, তার জন্য বেহেশত হারাম।" অথচ বর্তমান বিশ্বের সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত। আর বিশ্ব সভ্যতার দেশ বলে পরিচিত আমেরিকার নিগ্রোরা আজও সাদা আদমীদের সমান অধিকার পায়নি। তাদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ ও কর্মক্ষেত্র। শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে লেখা- নিগ্রো এবং কুকুরের প্রবেশ নিষেধ। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের সংঘাত দীর্ঘ দিনের। ভারত আজ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। প্রতিটি মুসলিম জনপদ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে রুদ্ধ। তাই একথা পরিষ্কার, সকল কিছুর ইনসাফপূর্ণ সমাধান রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবন-আদর্শেই রয়েছে।

ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ন্যায়বিচারের সর্বাপেক্ষা নাজুক স্তর হলো আপন জন। এমনকি নিজের উপর বিনা দ্বিধায় ইনসাফের দণ্ড প্রয়োগ করে যাওয়া। একদিন রাসুল (সা) প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে গণীমতের মাল বণ্টন করছিলেন এই সময় এক বৃদ্ধা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাকে সরাতে গিয়ে ছড়ির আঘাতে তার মুখমণ্ডলে সামান্য রক্ত বেরিয়ে পড়লো। রাসূল (সা) তখনি তাকে উঠিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" সে লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।" আজকের সমাজে নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকারকারীর সংখ্যা নেই বললেই চলে অথচ রাসূল (সা) এর যুগে প্রকাশ্য অপরাধে শুধু বিচারই করেননি বরং অপরাধী নির্দ্বিধায় এসে নিজের

অপরাধের স্বীকৃতি দেয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদা এক যিনাকারিনী মহিলা রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।" এভাবে তিনবার বলার পর চতুর্থবার আল্লাহর রাসূল (সা) তার কথা শুনলেন, তখন মহিলা বলল, "আমি অবৈধভাবে গর্ভবতী।" তখন আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে বাচ্চা প্রসব করার পর আসতে বললেন। এরপর উক্ত মহিলা আসলে তিনি বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর পর আসতে বললেন। নবী (সা) এর কথামত ঐ মহিলা আসলে তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। আর এক ফোঁটা রক্ত খালেদ ইবনে অলিদ (রা) এর গায়ের উপর পড়লে খালেদ কটূক্তি করে বললেন- 'একজন যিনাকারিনীর রক্ত আমার গায়ে পড়েছে।' তখন আল্লাহর রাসূল বললেন- "খালেদ মুখ সামলিয়ে কথা বল, আল্লাহতায়ালা উক্ত মহিলার তওবায় এত অধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন যে গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেও যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে শেষ হবে না।' আমীরুল মুমিনীন ওমর (রা) এবং উবাই ইবনে কাবের (রা) মধ্যে কোন এক বিষয়ে বিবাদ ঘটে। উবাই মদিনার বিচারক যায়িদ ইবনে সাবেতের (রা) নিকট মুকাদ্দামা দায়ের করেন। সমন পেয়ে ওমর (রা) আদালতে হাজির হন। আর একজন সাধারণ আসামীর মতোই আচরণ করা হয় তাঁর সঙ্গে।

মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের (রা) পুত্র কপ্ট সম্প্রদায়ের এক ছেলের গালে চড় লাগায়। বিচার চাওয়া হয় ওমরের (রা) নিকট। তিনি নির্দেশ দিলেন কপ্ট ছেলেটি গভর্নরের ছেলের গালে অনুরূপ চড় লাগাবে। কেউ কেউ আপত্তি তোলেন, ওমর (রা) বললেন, "কতকাল তোমরা মানুষকে গোলাম করে রাখতে চাও? তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন মানুষরূপে জন্ম দিয়েছে।"

আলী (রা) এর শাসনকালে তাঁর একটি হারিয়ে যাওয়া বর্ম এক ইয়াহুদির কাছে পাওয়া যায়। আলী (রা) বিচারকের দারস্থ হন। পুত্র ও গোলাম ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী হাজির করতে না পারায় বিচারক মামলা খারিজ করে দেন।

খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বিচারক নিযুক্ত করার দায়িত্ব পালন করতেন রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বিচারকগণই ইনসাফের দাবি অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে নিঃসংকোচে রায় প্রদানের স্বাধীনতা ভোগ

করতেন। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাসূল (সা) শুধু তার নবুয়্যতি জিন্দেগীতেই ইনসাফ কায়েম করেননি বরং তাঁর গোটা জিন্দেগীই ছিল ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। যার পরশে ওমরের মত শ্রেষ্ঠ শাসক পৃথিবী অবলোকন করেছে। এজন্য জনৈক সাবেক প্রেসিডেন্ট ওঁংঃরপব ড়ভ ঈড়হভবৎবহপব-এ দুঃখ করে বলেছেন, "আজ এই বিশাল অট্টালিকা অ.ঈ. রুমে বসে আমরা ন্যায় বিচার করতে পারছিনা।" অথচ হযরত ওমর (রা) গাছতলায় বসে ন্যায়ের শাসন কায়েম করেছিলেন। আমাদের সমাজে আজ বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।

উপসংহার

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আজ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। মানুষের রচিত মনগড়া আইনের যাঁতাকলে মানবতা আজ ধুকে ধুকে মরছে। এর থেকে বাঁচতে হলে রাসূল (সা) এর অনবদ্য জীবনের একটা বিশাল সমুদ্রে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে। অথচ এখান থেকেই পৃথিবীর পথহারা, অচেতন, অর্ধচেতন, তৃষ্ণার্ত মানুষগুলো পেয়েছে পথের দিশা। প্রত্যেক মানুষই পেতে চায় তার অধিকার ও মর্যাদা। একমাত্র রাসূল (সা)-ই সমাজের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানবরচিত জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন। আর মুহাম্মদ (সা) এর অনুসারীরা তাঁর জীবদ্দশায়ই এ আদর্শকে ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন করে একটি সোনালী সমাজের ভীত নির্মাণ করেছেন। বহু শতাব্দী অতীত হয়ে যাওয়ার পরও আজকের এই সমাজ ও সভ্যতা যতটুকু অধিকার ভোগ করছে তা ইসলামেরই অবদান। তাই আজকে প্রয়োজন ন্যায়বান মানুষের। যারা প্রত্যেকেই অধীনস্তদের অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবেন সচেষ্ট। আর তা শুধু রাসূলের (সা) জীবন অনুকরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

মে, ২০০৬

জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়

জাতীয় জীবনে আমরা আজ অগ্নিগিরির পাশে দণ্ডায়মান। সমাজকে এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ তার চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর আদি থেকে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যুগে যুগে মনীষীরা নানা পথ-মতের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। করেছেন জীবন উৎসর্গ, সংগ্রাম আরও কত কী! সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে সমাধানের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন।

দার্শনিকরা নানা মতাদর্শনে ভেতর এর অর্থ খুঁজে ডুবুরির মত ভূমিকা পালন করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণে ও বাস্ত বায়নের অসঙ্গতিকে দোষারোপ করছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা আবার বলছে সমাজের নানা ত্রুটির কথা। আবার সমাধানে নতুন নতুন আইন করেই চলেছেন। আইনজ্ঞদের আবার কারো ক্ষমতার পালাবদলে জোরালো অভিমত, পূর্ববর্তীরাই সর্বনাশের মূল। এবার আমরা পারব সব ঠিক করতে। এই শ্লোগানে মাতিয়ে তুলছে আজ গোটা বিশ্বকে।

অনুরূপ ধর্ম প্রবর্তকগণও নিজ নিজ ধর্মমতের ভিতর এর সমাধান খুঁজছেন। বিজ্ঞানীরা ঘুম পড়ানো অবোধ শিশুর মত মানুষকে জাগিয়ে তার আবিষ্কার হাতে তুলে দিয়ে বলছেন- এই নাও শান্তির পায়রা। এগুতে থাকল মানুষ; কত শতাব্দীকাল থেকে শতাব্দী। সে শান্তির সোনার হরিণ আজও ধরা দেয়নি। আর এই প্রেক্ষাপটে আজ জানা প্রয়োজন আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের কাঠামো ও পরিধি, জানতে হবে আমাদের জাতিসত্তাকেও। বুঝতে হবে মূল্যবোধকে। **What are moral values?** Moral values are the standards of good and evil, which govern an individual's behavior and choices. Individual's morals may derive from society and government, religion, or self. When moral values derive from society and government they, of necessity, may change as the laws and morals of the society change. An example of the impact of changing laws on moral values may be seen in the case of marriage vs. "living together."

আমাদের অবস্থা আজ কপালপোড়া বাড়িওয়ালার মত, যার ঘরে আগুন লেগেছে। প্রতিবেশীর প্রত্যেকেই আগুন নিভাতে এগিয়ে এসেছে। কারো হাতে খড়কুটো, কেউ বা কাঁথা কম্বল, কেউবা তেলের টিন এনে ঢালছে। উদ্দেশ্য একটাই, আগুন নিভাতে হবে। কিন্তু না বরং যে ঘর কিছু সময় নিয়ে জ্বলার কথা তা তার থেকে

দ্রুততম সময়ে জ্বলে ছারখার হল। আমরা প্রতিবেশীর ভালোবাসাকে খাটো করে দেখছি না। তাদের আন্তরিকতারও হয়তো ঘাটতি নেই। অভাব হচ্ছে কিসের মাধ্যমে আগুন নিভানো যাবে সেই জ্ঞানের ।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করেছেন। সকল জ্ঞান নয়; সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষ সত্যের কল্যাণ এবং সুন্দরের সন্ধান পেতে পারে। **Religion is another source of moral values.** Most religions have built-in lists of do's and don'ts, a set of codes by which its adherents should live. Individuals who are followers of a particular religion will generally make a show of following that religion's behavioral code. It is interesting to note that these codes may widely vary; a person whose religion provides for polygamy will experience no guilt at having more than one spouse while adherents to other religions feel they must remain monogamous.

সক্রেটিসও তার শিষ্যকে সেই উপদেশটি দিয়েছিলেন, "Know Thyself" অর্থাৎ নিজেকে জান। সক্রেটিসের বাণী নিয়ে আমরা গর্বিত। অথচ আমরা ইসলামের সেই কথাটি যদি জানতাম যে রাসূল (সা) বলেছেন : "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রবকাহু"- তুমি যদি আল্লাহকে চিনতে চাও তাহলে নিজকে জানো। তাহলে আমার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরো বৃদ্ধি পেত।

এটি আজ আমাদের একটি মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। আমাদের নিকট কি মূল্যবান জিনিস আছে তা না জানার কারণেই আমরা আজ অন্যের দারস্থ। আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, "ইয়াহ মেলু আসফারাহ"। তাই আজ আমাদের অবস্থা হচ্ছে সেই গাধার মত যে কেতাব বহন করে চলছে কিন্তু তার জানা নেই তার মাথায় কত মূল্যবান সম্পদ আছে।

অথচ আমাদের সমস্যা সমাধানে মানবতার ধর্ম আল ইসলাম আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত মানবতা বিধ্বংসী সমস্যার একটি চিরন্তন সমাধান দিয়েছে।

ইসলামের এ সমাধানের চিন্তা ও পদ্ধতি চিরন্তন ও শাশ্বত। কারণ পৃথিবীতে সংস্কারবাদীরা তাদের প্রচেষ্টার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। কেননা সমাজ পরিবর্তনের প্রদ্ধতি ছিল নিজস্ব চিন্ত প্রসূত। তাই তারা সফল হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সমাজ পরিবর্তনে এই স্রোতধারায় রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নিকট থেকে ওহী আসার পূর্ব পর্যন্ত সফল

হতে পারেন নি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও যদি সফল না হতে পারেন তাহলে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কথাতো ভাবাই যায় না। তিনি একটি পরিশীলিত ও পরিমার্জিত সমাজ উপহার দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহীর ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন মোবাইল ফোনের ব্যবহার নির্দেশিকা সেই দিতে পারে যে এটি আবিষ্কার করেছে। সেই ফর্মূলাই পরিচালনা করার জন্য কার্যকর। নির্দিষ্ট ক্যাটালগ অনুসরণ না করলে তা চালানো অসম্ভব। সুতরাং সীমাহীন হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অন্যায়-জুলুম-নির্যাতন প্রভৃতি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ। আর ইসলাম মানুষের হৃদয়-মনকে স্বার্থপরতা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা এবং উশৃঙ্খলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে দেয়। তাতে ব্যক্তি চরিত্রে জাগ্রত হয় আল্লাহর ভয়, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা।

ব্যক্তিজীবনে গড়ে উঠে নৈতিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা। আত্মসংযমে তাকে সর্বতোভাবে নিখিল সৃষ্টিজগতের প্রতি দয়াবান, সৌজন্যশীল, অনুগ্রহসম্পন্ন, সহানুভূতিপূর্ণ, বিশ্বাসভাজন, স্বার্থহীন, সদিচছাপূর্ণ, নিষ্কলুষ, নির্মল ও নিরপেক্ষ সুবিচারক এবং সর্বক্ষণের জন্য সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় করে দেয়। তার মধ্যে এমন এক উচ্চ পবিত্র প্রকৃতি লালিত পালিত হতে থাকে যার নিকট সবসময় মঙ্গলেরই আশা করা যেতে পারে। অন্যায় এবং পাপের কোন আশংকা তার দিক হতে পারেনা।

Moral character or **character** is an evaluation of a particular individual's moral qualities. The concept of character can imply a variety of attributes including the existence or lack of virtues such as integrity, courage, fortitude, honesty, and loyalty, or of good behaviors or habits. Moral character primarily refers to the assemblage of qualities that distinguish one individual from another-although on a cultural level, the set of moral behaviors to which a social group adheres can be said to unite and define it culturally as distinct from others. Psychologist Lawrence Pervin defines moral character as "a disposition to behave expressing itself in consistent patterns of functioning across a range of situations"

মানুষের মূল্য কত?

এবার খুঁজে দেখা যাক আসল মানুষটি কে? অথবা কি? কোন উপাদান তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে? তারই বা মূল্য কত? আর এই মূল্য থেকেই কি তার এত মর্যাদা? সম্ভবত বর্তমান যুগে এই প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে আর বিস্ময়কর বলে

মনে হবে না। প্রশ্নগুলো আগে করলে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিস্মিত হতাম। কিন্তু এখন আমরা প্রশ্নগুলোর জবাব না জানলেও তাৎপর্যটা সবাই জানি। কারণ আজকের বিজ্ঞান আমাদের জানার পরিধিকে করেছে অনেক বিস্তৃত।

প্রশ্নটি যদি কোনো শারীরতত্ত্ববিদ বা কোনো জীববিজ্ঞানীকে করা হয়, তাহলে তিনি হয়তো মানুষের দেহের গঠন, উপাদান, যে যে খনিজ-লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি বস্তু দ্বারা গঠিত, তাদের পরিমাণ ও দাম হিসেব করে মানবদেহটির দাম হিসেব করবেন।

বিখ্যাত চিকিৎসক ও দেহতত্ত্ববিদ মি. বিএ হাভার্ড জীবন-রহস্য উদঘাটনের মানসে একজন মানুষকে নিয়ে গভীর গবেষণার পর মত প্রকাশ করেন- এতে দশ গ্যালন পানি, সাবানের সাতটি গোল্লা তৈরি করা যেতে পারে সেই পরিমাণ চর্বি, নয় হাজার পেন্সিল তৈরি করা যেতে পারে সেই পরিমাণ কার্বন, দিয়াশলাইয়ের দুই শতটি কাঠি তৈরি করা যেতে সেই পরিমাণ লোহা, মুরগীর একটি ঘর লেপে দেয়া যেতে পারে সেই পরিমাণ চুন এবং সামান্য পরিমাণ গন্ধক ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে।

মানুষের চোখ, কিডনি এবং আরো অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করার রেওয়াজও বহুদিন থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। সেই হিসেবেও মানুষের একটি গড়মূল্য হিসাব করা সম্ভব। হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ পাইকারি আড়ৎ ও সুপারমার্কেট থাকবে। একজন চিকিৎসাবিদ এভাবেই মানুষের মূল্য নির্ধারণ করবেন। এখন বাজারে মানুষ বিক্রি হয়। নারী, শিশু, পুরুষ সব বয়সের, সব পেশার মানুষ বিক্রি হয়। ক্ষুধার জ্বালায় মা তার সন্তানকে ৫০ টাকায় বিক্রি করার ঘটনাও আমাদের সমাজে সংঘটিত হয়েছে।

প্রশ্নটিকে যদি কোনো ভাড়াটে সন্ত্রাসীকে করা হয়, তাহলে সেও তার উপায়ে মানুষের দাম হিসেব করবে। সে ক্ষেত্রে সে হয়তো কারো জন্য দশ লক্ষ, কারো জন্য পাঁচ লক্ষ, কারো জন্য এক লক্ষ, কারো জন্য পঞ্চাশ হাজার- এভাবে মূল্য নির্ধারণ করবে। ইদানিং এও শোনা যায় যে, মাত্র দুই হাজার টাকার ঝামেলায় কিংবা দুইশত টাকার চাঁদা দিতে না পারায় কাউকে হত্যা করা হয়েছে।

একজন অর্থনীতিবিদ যদি মানুষের মূল্য হিসাব করেন, তাহলে হয়তো তিনি এভাবেও ভাবতে পারেন যে, একজন মানুষ যোগ্যতাকে যদি ৫০/৬০ বছর ধরে প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলে সেই যোগ্যতা অর্থনীতিতে কী পরিমাণ value create করে বা মূল্য সৃষ্টি করে, তার একটি গড় হিসাব। তাছাড়া অন্যভাবেও

হিসাব করা যেতে পারে। একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে পৃথিবীর সম্পত্তি থেকে কতখানি ভোগ করে থাকে, তার গড় হিসাব। সে সারাজীবন wealth creation-এ কিভাবে অংশগ্রহণ করে, তার সঙ্গে তিনি তাকেও হয়তো হিসাবে আনবেন।

ধরুন সচিবালয়ের একজন অফিসার। তার অনেক দায়িত্ব। এর মধ্যে যদি যোগ্যতাকে বিক্রি করে রোজগার করে, তাহলে মাসে পাবে হয়তো আট হাজার টাকা। কিন্তু যদি সততাকে বিক্রি করে, তাহলে হয়তো খুব সহজেই কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে পারবে। এই দেহ নামক মানুষটির বেতন ১০/১২ হাজার টাকা। আর ভেতরের যে শক্তি তার সততাকে বিক্রি করতে দিল না এটাই মূল্যবোধ। অথচ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'যারা বিশ্বাসী এবং সঠিক পথে চলতে চান, তারা তেমন মূল্য গ্রহণ করেন না যা তারা শ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেননি।'

এভাবে আমরা আমাদের সততা, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, জ্ঞাতিত্ব, আত্মীয়তা ইত্যাদি সব বিক্রি করে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারি । আর না করার বিষয়টি মূল্যবোধ।

এটি দিয়েও মানুষের মূল্য হিসাব করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মানুষ মানে যদি শুধু দেহটি হয়, তাহলে তখনই সে তার দেহ, মন, শক্তি, ইচ্ছা ও যোগ্যতার মানে মানুষের মূল্যের হিসাব দাঁড় করাতে পারেন। অথচ রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন সম্পদের প্রতি তাকাবেন না। বরং নজর দেবেন তোমাদের অন্তর ও কর্মের প্রতি।" তাহলে এর থেকে বুঝা যায় দেহ দিয়ে মানুষের মূল্যের হিসাব করা কঠিন। কারণ এ পৃথিবীতে সকল মানুষই দেহ নামক অবয়বটিকে যতটুকু মূল্য দেন তা হচ্ছে তার ভিতরের অংশ তথা আত্মার বা রূহের মূল্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের মৃত্যুর পর কোন আপনজনই তার মৃতদেহটিকে বেশি সময় রাখতে রাজি হয় না। কারণ সবাই মনে করে আসল মানুষটি আর তার সাথে নেই। এতে তা যতই কষ্টকর হোক না কেন।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য মানুষ মানে যদি শুধু দেহটি হতো, তাহলে মানুষকে যতটা মূল্যহীন বা ছোট বলে আমরা মনে করেছি, ইবলিস কিন্তু তা করেনি। আল্লাহ মানবসৃষ্টির আগেই তাকে অত্যন্ত মূল্যবান করে প্রচার করেছিলেন, যার কারণে সৃষ্টির আগে তিনি যাবতীয় সৃষ্টিকুলের কাছে তার মূল্যকে তুলে ধরেছিলেন এবং যাবতীয় সৃষ্টিকুলকে মানুষের সামনে মাথা নত করতে বলেছিলেন। তিনি মানুষকে এতটা মূল্য দিচ্ছেন দেখে ইবলিসও বুঝে ফেলল মানুষ কতটা মূল্যবান। আর

তখনই সে তার দেহ-মনের সমস্ত শক্তি, ইচ্ছা, যোগ্যতা সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের অকল্যাণ ঘটানোর জন্য।

এভাবে প্রত্যেক পেশা এবং শ্রেণীর ব্যক্তিরাই তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এবার দেখা যাক, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের মূল্যের ব্যাপারে কী বলেছেন? তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন – "আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট তরল থেকে সৃষ্টি করিনি? আমি কি মানুষকে পচা, গলা, কাদা, টনটনে মাটি থেকে সৃষ্টি করিনি?" (সূরা ইয়াসিনঃ ৭৭)।

"মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্যে তর্ক করে!"

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি, গন্ধযুক্ত শুকনো মাটি থেকে।" (সূরা হিজর : ২৬)।

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুক্র থেকে, অথচ মানুষ প্রকাশ্যে ঝগড়াকারী হয়ে গেছে।" (সূরা নাহল : ৪)

এবার আসা যাক যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের মাপে মানুষ। মানুষ মানে যদি হয় তার যোগ্যতা, উদ্দেশ্য, গুণ, বৈশিষ্ট্য- তাহলে তার মূল্য কত?

মানুষ মানে যদি হয় ব্যক্তিত্বটি, যোগ্যতাটি হয় (শুধু দেহটি নয়) তাহলে তার মূল্য নিশ্চয়ই আর একটু বেশি হবে। এখন তাহলে আমরা আর একটি প্রশ্নের উত্তর পেলাম, মানুষ মানে যদি হয় একটি ব্যক্তিত্ব বা মনুষ্যত্ব, তাহলে তার মূল্য কত?

মূল্যবোধের মাপে মানুষ

তাহলে মানুষের মূল্য কত? এই প্রশ্নের কোনো একক জবাব সম্ভব নয়। কারণ মানুষের বাজারমূল্য যা, তার উৎপাদনমূল্য বা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তা নাও হতে পারে। আসলে মানুষ নিজেকে কিভাবে চিহ্নিত করল তা দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে গেল তার মূল্য কত।

তাহলে আমরা পাচ্ছি ঠিক বিপরীত ধরনের কিছু মানুষ একেবারেই নিকৃষ্ট, মূল্যহীন পশুর মতো, কিংবা পশুর চেয়েও অধম; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত মূলবান। যাবতীয় সৃষ্টিকুলের চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি, যার কারণে যাবতীয় সৃষ্টিকুলের ওপর এটি বাধ্যতামূলক হয়ে গেল যে তারা যেন মানুষকে সিজদা করে। ইমাম তাবারানী ও ইমাম বায়হাকী (র) তাঁদের শু'আবুল ইমান অধ্যায়ে এবং আল্লামা খতিব বাগদাদী (র) স্বীয় তারিখ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট মানবজাতি অপেক্ষা অন্য

কোন সৃষ্টিই অধিক সম্মানের হবে না। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের ক্ষেত্রে কি এটা প্রযোজ্য হবে? অর্থাৎ নিকটবর্তী ফেরেশতাদের চেয়েও কি মানুষের মর্যাদা বেশি? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও (এক শ্রেণীর) মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হবে না। কেননা ফেরেশতাদের অবস্থান সূর্য ও চন্দ্রের মত। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র যেমন সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম পালনে ব্যস্ত, তেমনি ফেরেশতাগণও আল্লাহর নির্দেশের সম্মুখে আত্মসমর্পিত। তাঁদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই।"

এই আপাত আত্মবিরোধ থেকে আমরা আর একটি প্রশ্ন আবিষ্কার করি, মানুষের মূল্য কত? মানুষ মানে শুধু দেহটি নয়; শুধু দেহের বিচারে- মানুষ না, না শুধু প্রাত্যহিক কাজ কর্মের বিচারে। তাই মানুষ, একজন নবীও যেমন হতে পারে, আবার একজন অবিশ্বাসীও। কোন জিনিস তার মূল্যের এত ব্যবধান সৃষ্টি করে? আল্লাহ বলছেন: "বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বুদ তো একই মা'বুদ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে সে, যেন ভালো কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কারো শরিক না করে।" (সূরা কাহাফ : ১১০)।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে শুরু করে। তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তার উপর তা স্থাপন করেন। তাতে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। পর্বতমালা দেখে ফেরেশতাগণ অবাক হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বত থেকে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, লোহা। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা থেকে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর বাম হাত থেকে তা গোপন রাখে।'

এ থেকেও কি বোঝা যায় না যে তার ক্ষেত্রে দেহবৃত্তি ছাড়াও অন্য সম্বন্ধে তাদের ধারণাটা খুব বেশি বড় ছিল না, যার কারণে অর্থ-সম্পদ, অহঙ্কার, ক্ষমতা এগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরকে বড় করে দেখার প্রয়াস পেত। কিন্তু

ভেতরে তাদের এই বোধ বদ্ধমূল ছিল যে, মানুষ নেহায়েত রক্ত মাংসে গড়া এক জাতীয় জীব।

মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

মহান আল্লাহ তা'য়ালার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদা সর্বাধিক। এ জন্য মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ'- এই বক্তব্যের দ্বারা মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরআনের বাণী : 'তিনি সে মহান সত্তা যিনি মানবজাতির কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।' বস্তুত মহান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। মহানবী (সা) বিদায় হজের ভাষণে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেন :'তোমাদের এই পবিত্র শহরে এই পবিত্র মাসে আজকের এই দিনটি যেমন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ তেমনি তোমাদের পরস্পরের রক্ত, তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ এবং পরস্পরের মান-সম্মানও পবিত্র এবং মর্যাদাপূর্ণ।'

মানুষের ধন-সম্পদ, রক্ত ও মান-সম্মানের নিশ্চয়তা দিয়ে বিদায় হজের ভাষণে তিনি যে ঘোষণা করেছেন, বস্তুত মানবজাতি ছাড়া কোন সৃষ্টি সম্পর্কে এরকম কথা বলা হয়নি।

নিরপরাধ কোন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার সমতুল্য। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'যে ব্যক্তি হত্যা বা সন্ত্রাস ব্যতীত কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে, সে যেন প্রথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি এমন নিরপরাধ মানুষকে বাঁচাল সে যেন সকল মানুষকে বাঁচাল।'

অর্থাৎ একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার অর্থ পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যার সমান অপরাধ করল। একইভাবে কোন নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হলে (যালিম অত্যাচারীর হাতে পড়লে) তাকে রক্ষা করলে সে পৃথিবীর সকল মানুষকে রক্ষা করার সমান পুণ্য অর্জন করল। এর দ্বারা একজন মানুষের মর্যাদা তার জীবন ও সম্মানের প্রতি ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছে, তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা আইনে এত বড় নিশ্চয়তা দিয়েছে বলে নজির নেই। কিন্তু এতবড় মর্যাদা মানুষের দেহকে কেন্দ্র করে নয়। বরং ভিতরের মূল্যবান রত্নটিই উদ্দেশ্য। আর সেই অমূল্য ধনটির নামই আত্মা।

মানুষের আত্মা বা নিজ বলতে মানুষের দেহের অংশটিকে বুঝায়। কিন্তু মানুষ বলতে মূলত আত্মাকেই নির্দিষ্ট করে। আর আত্মা বা রূহের দিকটি সকল

মানুষেরই একরকম। সাদা-কালো, ধনী-গরিব, বংশ কোন কিছুরই পার্থক্য নেই এখানে। এমনকি নেই কোন জাতিগত পরিচয়ও। অর্থাৎ আল্লাহ সকল রূহ বা আত্মাগুলোকে পবিত্র তথা সত্যের উপর সৃষ্টি করেছেন।

এরপর মানুষ তার কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছে। সত্য তথা পবিত্রতার উপরই যে আত্মার সৃষ্টি আর কর্মপরিধি তাকে গ্রেডিং এর মধ্যে Classification করেছে। যেমন- মুমিন, মুসলিম, মুত্তাকী, মুহসিন ইত্যাদি উপাধি। সুতরাং মানুষটি হচ্ছে আত্মা, আর কর্মটিই হচ্ছে তার পরিচয়। এবং বাকি সবই খোলস মাত্র। এজন্যই আল্লামা ইকবাল মানুষের "খুদির মধ্যেই আসল মানুষটিকে" খুঁজতে চেয়েছিলেন।

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও বলেছেন:

"মানুষের আত্মার মধ্যে যখন ইনসাফ প্রবিষ্ট হয় তখন তার উজ্জ্বল আভা তার সমস্ত আত্মিক শক্তিসমূহকে আলোকিত করে। কেননা মানুষের সমস্ত নৈতিকতা ও মহৎ বৈশিষ্ট্য ন্যায়নীতির ফোয়ারা হতে উৎসারিত হয়। এটা মানুষকে তার ব্যক্তিগত কাজকর্মকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা প্রদান করে যা মানুষের চূড়ান্ত শান্তি ও বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নৈকট্যের শীর্ষস্থান হিসেবে পরিগণিত।"

আর বোধ মানে চেতনা, অনুভূতি, উপলব্ধি। সুতরাং এই বোধশক্তিই হচ্ছে Sense. এই বোধশক্তি আল্লাহ সকল মানুষকেই দিয়েছেন, যেটিকে বলা হয় Common Sense । মানুষের বোধশক্তি থাকার কারণেই তার নিজের অসৎ কাজের জন্য আল্লাহকে দায়ী করতে পারবে না।

তাই মানুষ যতবড় অপরাধই করুক না কেন নিজের ভুলের স্বীকৃতি নির্দ্বিধায় প্রদান করে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার যে, আসল মানুষটি হচ্ছে আত্মা ও বোধের সমন্বয়। আর এর মাধ্যমে অর্জিত জিনিসকে কেউ কেউ বলেছেন Personality বা ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বের মাপে মানুষ

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মানুষের একটি সার্বিক পরিচয়, অর্থাৎ ব্যক্তির পরিপূর্ণ রূপ। একজন মানুষের চেহারা, স্বাস্থ্য, কথা বলার ধরন, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ, গুণ সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, তার বিশেষত্ব।

মনোবিজ্ঞানী Alport ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে খুব সংক্ষেপেই বলেছেন, 'Personality is what a man really is'. মান (Munn) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য

ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ ঐক্যই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব।"

উডওয়ার্থ ও মারকুইসের মতে, "ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিত্বকে কোন ব্যক্তির আচরণের গুণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যা তার চিন্তার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি, তার মনোভাব ও আগ্রহ, কাজের প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত জীবন দর্শনে প্রকাশ পায়।"

মনোবিজ্ঞানী ওয়ারেন (Woaren-1934) বলেন, "ব্যক্তিত্ব হলো কোন ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বিত সংগঠন যা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে।"

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সেই সংগঠিত মানসিক গুণাবলির সমষ্টি যা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয় এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। (The term personality refer to the unique organization of relatively enduring psychological characteristics possessed by and individual, as revealed by his interaction with the environment.)

Mc. Keahie Doyle সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে- ১) প্রত্যেকটি মানুষই তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বলে স্বতন্ত্র। ২) প্রত্যেকেই কতকগুলো অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ৩) অন্যের সাথে আচরণের আলাদা ধরন বৈচিত্র্যের একটি সংগঠন দ্বারা ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত ও ৪) ব্যক্তিত্বের সংগঠনটি প্রকাশিত এবং এটি পর্যবেক্ষণযোগ্য।

আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে দুটি সত্তা, ১) Humanity (মানবতাবোধ) ২) Animality (পশুত্ব)। Animality বা পশুত্ব যখনই Humanity বা মানবতাবোধের উপরে বিজয়ী হয় তখন মানুষের দেহ নামক খোলসটি হয়ে পড়ে অন্তঃসারশূণ্য, হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব। আর Humanity যখন Animality এর উপরে বিজয়ী হয় তখনই মানুষ নামক আসল ব্যক্তিটি মানুষের চোখে পরিগ্রহ হয়। তার কাছে মানবতাবোধ ও কল্যাণ ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না। সুতরাং মানুষের Animality বা পশুত্বের অংশটির সাথে ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণই তাকে বিপদগামী করে। কিন্তু আবার ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণের সাথে মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে স্বাধীনতা। এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষের আত্মা ও বোধের অংশকে বারবার আঘাত করছে ইন্দ্রিয়ের চাহিদা ও স্বাধীনতা। আর এ দুটি জিনিসের সমন্বয়ে এ পৃথিবী। একদিকে মানুষের ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণের অবাধ স্বাধীনতা অন্যদিকে পবিত্র আত্মা ও

বোধের অংশটুকু। আর পৃথিবীতে এ দুটি জিনিসের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে যে জিনিসটি সেটিকে বলা হয় Morality, Manner বা Ethics. নোবেল বিজয়ী অমর্ত্যসেন তার দীর্ঘ গবেষণায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অগ্রগতির সাথে সমান্তরালভাবে Ethicsকে গুরুত্ব দেয়ার কথা তুলে ধরেছেন।

মানুষের মধ্যে Morality, Manner বা Ethics নিম্নোক্ত জিনিসের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব- সত্য (Truth), কল্যাণ (Goodness) ও সুন্দর (Beauty)। এই তিনটি মূল্যকে (Intrinsic Value) বলা হয়। এ মূল্যগুলো স্বনির্ভর এবং এগুলোকে আমরা কামনা করি আমাদের নিজের জন্য– অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। মানব মনের তিনটি বৃত্তি– চিন্তাবৃত্তি (Thinking), কৃতিবৃত্তি (Willing) এবং অনুভূতিবৃত্তির (Feeling) আদর্শরূপে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরকে পাওয়া যায় বলে এই তিনটি মূল্যকে মানসিক মূল্য (Phychical Value) বলা হয়ে থাকে। চিন্তার আদর্শকে বলা হয় সত্য। যে চিন্তা সত্য, সে চিন্তা মূল্যবান, আর যে চিন্তার মধ্যে সত্য নেই সে চিন্তা মূল্যহীন। আমাদের চিন্তা বচনের (Proposition) মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। কাজের শুধু বচনেরই সত্য-মিথ্যা বিচার করা যায়। যখন কোন বচন বস্তুর অনুরূপ (Corresponding) হয় তখন সে বচনকে সত্য বলা হয়। সুতরাং আদর্শ বচন বলতে আমরা বুঝবো সেই বচনকে যার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। সত্যের মূল্যটিকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে আমাদের মুখনিঃসৃত বচনকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য হতে হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সত্য কথা বলতে হবে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু আমল দান করুন যা দিয়ে আমি জীবন নির্বাহ করতে পারি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে হামযা, তোমার নিকট দুটি জীবনের কোনটি প্রিয়: (১) যে জীবন অনন্ত বা চিরস্থায়ী; অথবা (২) যে জীবন ক্ষণস্থায়ী? হযরত হামযা (রা) বললেন, আমার নিকট এমন জীবনই প্রিয় যার মৃত্যু নেই অর্থাৎ চিরস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তোমার জন্য তাই হোক।' এখানে চিরস্থায়ী জীবন বলতে শহীদি মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। এই শহীদি মৃত্যুই কুরআনের ভাষায় চিরস্থায়ী। কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে : 'আমি নিশ্চয়ই সম্মানিত করেছি মানবজাতিকে এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি জলে ও স্থলে।'

'হে মুমিনগণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যারা নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না।' এই শহীদি জীবনের মর্যাদা হলো চিরস্থায়ী যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। সে জন্যই রাসূল (সা) হযরত হামযা (রা)কে এ ধরনের জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরিণতিতে দেখা যায়, হযরত হামযার জন্য সে মৃত্যুই নির্ধারিত ছিল।

দ্বিতীয় হচ্ছে- কল্যাণই (Goodness) কর্মের আদর্শ। কর্মের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ কল্যাণের প্রকাশ ঘটে কর্ম ততটুকুই মূল্যবান। কর্মের মূল্য কল্যাণ সাধনের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের এমন সব কর্ম সম্পাদন করতে হবে যার দ্বারা জীবজগত উপকৃত হয়। কিন্তু কল্যাণের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন, দৈহিক সুখই পরম কল্যাণ। যে কর্ম সুখ বয়ে আনে বা দুঃখ নিরসন করে সে কর্ম ভাল। আর যে কর্ম সুখে বাধা দেয় বা দুঃখ সৃষ্টি করে সে কর্ম মন্দ। আবার কেউ কেউ দেহের দাবিকে অস্বীকার করে কৃচ্ছ্রতা সাধনকে পরম কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ বলে মনে করেন। কৃচ্ছ্রতাবাদীরা সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন বিচারবুদ্ধিকে। তারা ইন্দ্রিয়সুখকে সর্বপ্রকারের জীবন থেকে ছেঁটে ফেলার পক্ষপাতী। পূর্ণতাবাদ অনুসারে দেহ ও আত্মা বা জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে পরম কল্যাণ নিহিত।

অনুভূতির আদর্শের নাম সুন্দর (Beauty)। সৌন্দর্যই অনুভূতির লক্ষ্য। যে অনুভূতি যতটুকু পরিমাণে সুন্দরকে প্রকাশিত করে সে অনুভূতির মূল্য ততটুকুই। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। সত্য হচ্ছে বাস্তব জগতের সাথে আমাদের ধারণা ও বচনের সঙ্গতি; কল্যাণ হচ্ছে বিচার-বুদ্ধির সাথে ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার সঙ্গতি এবং সৌন্দর্য হচ্ছে আকারের সাথে উপাদানের সঙ্গতি। মূল্য তিনটি মানব মনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া- চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতির আদর্শ হিসেবে উদ্ভূত হলেও এটা ধারণা করা উচিত হবে না যে মানসিক মূল্য তিনটি পরস্পর সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই। মূল্য তিনটির মধ্যে পার্থক্য করা যায় বটে কিন্তু একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটি মূল্য থেকে অন্য দুটি মূল্যের উৎপত্তি হয়েছে একথা যেমন বলা যায় না তেমনি একটি মূল্য আর একটি মূল্যের অধীনস্থ তাও বলা যায় না। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এই তিনটি মূল্যের মধ্যে কোন বিরোধ আছে এরূপ ধারণা করাও উচিত হবে না। ব্যক্তি যতই পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হয় মূল্য তিনটির মধ্যকার গভীর ঐক্যের নীতিটি ততই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

মূল্যগুলির একটি অন্যটির অধীন না হয়েও ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ও ক্রমোন্নতিতে নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হল এর ধারাবাহিকতা নিয়ে কেউ কেউ বলেন, যেটি কল্যাণ সেটিই সুন্দর আবার কারো মতে, যেটি সুন্দর সেটিই কল্যাণকর ও সত্যও বটে। কিন্তু ইসলাম বলে যেটি সত্য সেটিই সুন্দর ও কল্যাণকর। তাই সত্য দিয়ে যদি আমাদের শুরু হয় তাহলে সেটি হবে গোটা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। কল্যাণ এবং সুন্দর বিষয়টি আপেক্ষিক। কিন্তু সত্যের কোন আপেক্ষিকতা নেই। কারণ সত্যই যাবতীয় কর্মের বীজ। বীজের অস্তিত্বের উপর যেমন গাছের অঙ্কুরিত হওয়া নির্ভর করে তেমনি সত্যের উপর নির্ভর করে সকল কর্ম। এজন্য এক ব্যক্তিকে রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি সব অপরাধ করলেও, মিথ্যা কথা বলোনা, দেখা গেল এ লোকটি রাসূল (সা) এর সাথে ওয়াদা ঠিক রাখতে গিয়ে এক এক করে সকল অপরাধ করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং যাবতীয় কর্মের নির্যাস বা মূল যদি সত্যকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সকল কাজের মধ্যে মানবতার জন্য নিহিত রয়েছে সুন্দর ও কল্যাণ।

যদিও প্লেটো (Plato), বসাঙ্কয়েট (Bosamqiet), সার্লে (Sarley) মনে করেন কল্যাণই (Goodness) সর্বোৎকৃষ্ট মূল্য এবং সত্যতা ও সৌন্দর্য নৈতিক মূল্যের নিয়ন্ত্রণাধীন আবার ক্রসে (Croce) ও মানসটারবার্গ (Munsterberg) সৌন্দর্যকেই মৌলিক ও অরূপান্তরযোগ্য মূল্য (The fundamental and Irriducible form of Valuation) বলে মনে করেন। কীটস (Keats) এর কাছে সত্য ও সুন্দর অভিন্ন। তিনি বলেন, Truth is beauty and beauty is truth. তবে তিনি সুললিত উক্তির ব্যাখ্যা দেননি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও কল্যাণকে অভিন্ন করে দেখেছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটেছে কল্যাণকর মূল্য সৃষ্টির অপরিহার্য উপজাত (By product) হিসেবে। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি কোন বস্তুতে বা শিল্পকর্মে সৌন্দর্য ও কল্যাণের সহ-অবস্থান সব সময় আশা করা যায় না। মানুষের কোন সুন্দর সৃষ্টি সব সময় কল্যাণকর হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না এই কারণে যে, সৌন্দর্যের শর্ত ও কল্যাণের শর্ত এক নয়। মানুষের সৃষ্ট এমন বস্তু রয়েছে যা দেখতে সুন্দর কিন্তু নৈতিক বিচারে কল্যাণকর নয়, বরং ক্ষতিকর। যেমন- মদ্যপান, সুদগ্রহণ ইত্যাদি।

জাতীয় জীবনে বিপর্যয়

মানুষ আজ বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে এত বেশি লিপ্ত যে দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া অন্যান্য মূল্যগুলি মানুষের চেতনায় আজ আর স্থান পাচ্ছে না। পেশিশক্তি আর অর্থবলের কাছে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর আজ পরাভূত। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের এই বিপর্যয়। ডা. মার্ডিন বলেছেন: "সম্পদই মানুষের জীবনের সবকিছু নয়। টাকা জমানোর উপরই মানুষের প্রকৃত সুখ নির্ভর করে না। তথাপি অনেক মানুষ এ ভুল করে। তারা বিশ্বাস করে যে, টাকাই হচ্ছে মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে, তারা তাদের জীবনের এ মূল্যবান অধ্যায়কে সম্পদ অন্বেষণের কাজে অপচয় করে এবং এভাবে জীবনের অন্য সবকিছু হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। এটা হচ্ছে মানুষের চিন্তার বড় একটি ভ্রান্ত পথ এবং এটা বহু লোকের দুঃখ - দুদর্শার মূল কারণ।" ইমাম আলী (র) বলেছেন: "একজন লোভী ব্যক্তি অপমানের হাতে বন্দী। তার এ বন্দীদশা কখনও শেষ হবে না।" আজ আমাদের সমাজের দুর্নীতিবাজদের করুণ চিত্র সেই কথারই সাক্ষ্যবহন করে। "হায়রে অর্থ তুই সকল অনর্থের মূল" খতিয়ান থেকে দেখা যাক। ২০০২ সালের ডিসেম্বর টিআইবি এর রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশে ৭টি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত বছরে ঘুষ বাবদ জনগণের কাছ থেকে মোট ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা আদায় করে। এই ৭টি খাতের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পুলিশ বিভাগ। এই বিভাগ দুর্নীতি বাবদ বছরে আদায় করে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। অন্য খাতগুলির মধ্যে নিম্ন আদালত ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা, সরকারি হাসপাতালগুলো তথা স্বাস্থ্য খাত ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা, শিক্ষা খাত ৯২০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাত ১৮২ কোটি টাকা, কর বিভাগ ১২ কোটি টাকা দুর্নীতি বাবদ আয় করে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয় প্রতি বছর সরকারের কেনা টাকায় প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়। সরকার প্রতি বছর প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ও সেবা কেনে।

রাজস্ব আয়ের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে প্রতিদিন ৩০-৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। এখানে অবৈধ লেনদেন হয়ে থাকে আড়াই কোটি টাকা। কতিপয় কাস্টমস কর্মকর্তা এখানে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। ৪১ জন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুত হলেও তাদের বিরুদ্ধে আজো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ ঐসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা।

প্রত্যেক বছর এনজিওরা ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে দারিদ্র্য বিমোচনে। দরিদ্র জনগণকে ৪০ শতাংশে সুদ উৎসর্গ করতে হয়। যা বড় ধরনের দুর্নীতির শামিল।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে অষ্টম জাতীয় সংসদে কোরাম সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য সংসদ কার্যক্রমের ২২৭ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। এর ফলে সংসদের ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা অপচয় হয়েছে। ১৮৩ জন সংসদ সদস্যের টেলিফোন বকেয়া বিলের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

এখন ১ অথবা ২ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক গাড়ির মালিকের সন্ধান মিলেছে। সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রীর ট্রাডিলাক গাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যানের বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ অনুরূপ গাড়ি, সিলেটের এক সাবেক এমপির ইনফ্যানিটি কি এক্স ৫০ তিনটি গাড়ি। ঢাকার সাবেক এক এমপির এবং জনৈক সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি থেকে পাঁচটি করে বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়েছে। বরিশাল বানড়ী পাড়ার সাবেক এমপি ও হুইপ শুধু তার ব্যবহারের জন্য ১০ বছর ধরে সড়ক ও জনপদের একটি ফেরি নিজ দখলে রেখেছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ দেশের সবগুলো ব্যাংক ১১ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ মওকুফ করেছে। এর মধ্যে ৪ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মওকুফকৃত ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ৯০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

সম্প্রতি দুর্নীতির দায়ে যাদের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে তাদের প্রদর্শিত আয়ের চেয়ে অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ৪০ গুণ বেশি। এ ৫৫ জনের অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকারও বেশি।

তৎকালিন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ বলেন, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে কেবল বিদ্যুৎ খাত থেকেই বিদেশে পাচার হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। যদিও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দই ছিল সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা। এটা তথ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি থেকেও যা ভয়াবহ।

মামুন স্বীকার করেছে যে বিদেশী ব্যাংকে তার ৩০০ কোটি টাকা রয়েছে যা সে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে এবং অবৈধভাবে পাচার করেছে। এর বাইরেও তার রয়েছে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।

দুদকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তির হিসাব দাখিল করা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের ৬ পরিবারের কাছে ৮০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তাদের হিসাব বহির্ভূত আরো যে অনেক সম্পত্তি রয়েছে সেটা এখনো অনাবিষ্কৃত। তবে এই ৬ পরিবারের কাছে ব্যাংক পাবে ৪ হাজার কোটি টাকা। এই ৬ জন হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহ আলম, আকতারুজ্জামান বাবু, আবুল হাসান আব্দুল্লাহ, সাবেক এমপি হাজী সেলিম, হাজী মকবুল হোসেন, জাহাঙ্গীর কবির নানক।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ডক্টর মইনুল হোসেন ঠিকই বলেছেন– 'ব্যাংকগুলো সারাদেশ থেকে আমানত কুড়িয়ে এনে ৫০০ লুটেরাদের হাতে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তুলে দিচ্ছে এখন ৩০ হাজার কোটি টাকা। ১২ হাজার কোটি টাকা অবলোপন অথবা অন্য খাতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোও দুর্নীতিবাজদের সহযোগী এবং তাদেরকে অধিকতর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করেছে।' অর্থনীতিবিদ সমিতির এক ওয়ার্কশপে সাবেক আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, দুর্নীতি ও অপচয় না হলে দেশের প্রবৃদ্ধির হার দুই অঙ্কে পৌঁছে যেত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শুরু হওয়া দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এর কতটুকু সুফল পাব, তা নিয়ে। কারণ আল্লাহতায়ালা মানুষ সংশোধন করার নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন মদ হারাম করা হয়েছে তিনটি ধাপে। এ জন্যেই বিরাট জনগোষ্ঠী সংশোধনের এ গতি অবলম্বন করেছে।

একদিনে মদ হারাম করলে কেউ হয়তো এ প্রক্রিয়া মেনে নিতেন না। কারণ সেই সময় মদ সবার নিকট প্রিয় ছিলো। প্রথমে বলা হয়েছে তোমরা মদ খেয়ে নামাজের কাছে যেয়ো না। তারপর এর কুফল তুলে ধরা হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত ভাবে হারাম করা হয়েছে।

আমরাও আমাদের দেশের সমস্যাগুলো সমাধানে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন না করলে সংশোধনের নীতি একেবারেই অসম্ভব হবে। নীতি ও প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে ভালো উদ্যোগও অনেক সময় বুমেরাং হয়।

মানব সংশোধনের প্রক্রিয়া যদি এতই সহজ হতো, তাহলে আল্লাহতায়ালা রাসূল (সা)কে মানুষের কাছে গিয়ে বুঝানোর দায়িত্ব দিতেন না। প্রয়োজন ছিল না

ত্যাগ স্বীকার করার। পরিশুদ্ধ করার এই প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে যদি শক্তি দিয়ে সংশোধন করতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে তাদেরকে আত্ম-উপলব্ধির কাতারে সামিল করেছেন বিধায় পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বর, অসভ্য মানুষগুলো শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছে।

দৈহিক ও অর্থনৈতিক এ দুটি অতিমূল্যায়নের জন্যই আজকে আমাদের এই নৈতিক বিপর্যয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের জানা প্রয়োজন মানব জীবনে দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের সঠিক অবস্থান কোথায় এবং তাদের ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত। আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা বইতে বলা হয়েছে-

লোভ যখন একটি জাতিকে পেয়ে বসে, তখন তা ঐ জাতির গোটা সামাজিক জীবনকে দৃঢ়তা, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের পরিবর্তে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনৈক্যে পরিবর্তিত করে। স্বভাবতঃই এ ধরণের সমাজে নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নতির কোন সুযোগ থাকে না। এ দুনিয়ার লোভী লোকদের উদাহরণ রেশম গুটির মত। যত বেশি রেশমী সূতা সে তার গায়ের চতুর্দিকে বুনে, তত কম সুযোগই সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পেয়ে থাকে। কারণ, এভাবে এক সময় সে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে। আজকে এরই বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

জগতের বস্তু হিসেবে আমাদের দেহেরও একটা মূল্য আছে। নিরোগ দেহ মূল্য লাভের সহায়ক। মূল্যকে জীবনে রূপায়িত করার প্রথম শর্তই হলো সুস্থ দেহ। তবে কোন কোন সময় এই দেহই জীবনে মূল্যকে বাস্তবায়িত করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত আছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা, লোভ, বাসনা ইত্যাদি প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলির বন্ধন থেকে মুক্তির কোন সহজ পন্থা না থাকায় প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে দেহের বন্ধনের মধ্য দিয়েই মুক্তির পথ খুঁজে পেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন সহজ পথ মুক্তির জন্য নির্ধারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/লভিব মুক্তির স্বাদ।' অসংখ্য বন্ধনের মাঝেই আমাদের মুক্তির পথের সন্ধান মিলবে। আগেই বলা হয়েছে দেহের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, এটা স্বতঃমূল্য লাভের সহায়ক মাত্র (Human body is a means to an end not an end in itself) অথচ বৈধ অবৈধ পন্থা বিচার না করে দেহ পোষণের জন্য মানুষ অতিরিক্ত সম্পদের মজুদদারিতে ব্যস্ত। জীবনে মূল্য অর্জনের লক্ষ্যে দেহকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তার জন্য পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

অতি ভোজন, মদ্যপান, ধূমপান আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সুস্থ দেহের জন্য স্বল্পাহার, মুক্ত বাতাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ব্যায়াম অপরিহার্য। কেবল ভুরিভোজনের উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকতে চাইলে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, জীবনও বিপন্ন হবে। সুতরাং We should eat to life, we should not live to eat.

কিন্তু বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার যাবতীয় সামগ্রী আমরা পেয়ে থাকি। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের প্রয়োজন সীমাহীন হলেও কেবলমাত্র সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তা লাভের জন্য যেটুকু অর্থের দরকার পড়ে, মানুষের কাছে অর্থের মূল্য ততটুকুই। তাছাড়া অর্থ দ্বারা অনেক কিছু ক্রয় করা গেলেও অন্তত দুটি জিনিস ক্রয় করা যায় না– একটি হলো দেহের স্বাস্থ্য ও অন্যটি হলো মনের শান্তি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত দুটি জিনিস অর্থ ক্রয় করতে সক্ষম না হলেও কোন কোন সময় হরণ করতে পারে। স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতে পারে টেবিলের উপর পরিবেশিত মসলাদার সুগন্ধী খাদ্যের প্রাচুর্য, আর মনের শান্তি হরণ করতে পারে অর্থ হারানোর ভয়। এ জন্য একটি ফরাসি প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে– Little Money, Little Care. সম্পদ জ্ঞানী লোকদের নিকট যেমন কল্যাণের হাতিয়ার হতে পারে, মূর্খদের নিকট তেমনি অত্যাচারেরও হাতিয়ার হতে পারে। অর্থকে তাঁবেদার করতে হবে, অর্থের তাঁবেদার হলেই বিপজ্জনক। ইমাম গাজ্জালীর একটি উপমা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি দুনিয়াকে একটি নদী এবং সম্পদকে পানির সাথে তুলনা করে বলেছেন, নদী পার হতে নৌকার প্রয়োজন কিন্তু পানি হচ্ছে তার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু পানি যদি নৌকার ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে মৃত্যু যেমনি অনিবার্য ঠিক তেমনি অধিক সম্পদের মোহও জীবনকে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সম্পদের ঠিক ব্যবহার না জানার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পদের প্রাচুর্য অনিষ্টকর হয়ে থাকে।

ডা. রোজকীনের মতে: প্রকৃতপক্ষে, লোভী ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ পেলেও কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যেমনিভাবে জ্বলন্ত আগুনে যত লাকড়িই দেওয়া হোক না কেন তা সবই পুড়ে যাবে।

"আমার জীবনের প্রতিটি ভুল আমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং আমাকে সুখ হতে বঞ্চিত করবে, এই ভুল আমাকে বুঝা এবং উপলব্ধি করা হতে অন্যদিকে সরিয়ে নিবে। এর বিপরীত ক্রমটাও সত্য। প্রতিটি প্রচেষ্টা, সত্য বা

ধার্মিক কাজ আমাকে আমার যাবতীয় আশা ও লক্ষ্যার্জনে আমার সহযোগী হয় এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করে।"

ডা. মার্ডিন বলেছেন, "কতিপয় নির্দিষ্ট চিন্তা লোভ, অর্থলোলুপতা ও অন্যসব মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে জন্মলাভ করে। এসব যে শুধু শরীরের ক্ষতিসাধন করে তা নয় বরং আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব, লোভও আমাদেরকে একটি সুন্দর জীবন হতে বঞ্চিত করে এবং আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে বিনষ্ট করে। অর্থলিপ্সা আমাদের স্বাভাবিক মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে।" ইমাম আলী (র) বলেছেন, "লোভ আত্মাকে অপবিত্র করে, ধর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং যৌবনকে ধ্বংস করে।" রাসূলুল্লাহ (সা) লোভ হতে সৃষ্ট দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : "একজন লোভী ব্যক্তি সাত প্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়-

দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, যা তার দেহের ক্ষতিসাধন করে, এবং যা তার জীবনের জন্য ক্ষতিকর। বিষণ্ণতা, যার শেষ নেই।

ক্লান্তি, যা হতে মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাণ এবং ঐ পরিত্রাণের সঙ্গে সঙ্গে লোভীরা আরও অধিক ক্লান্তিতে পৌঁছে যায়।

ভীতি, যা অহেতুকভাবে তার জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

দুঃখ, যা নেহায়েত অপ্রয়োজনে তার জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটায়।

বিচার, যা আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করেন।

শাস্তি, যা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই

লোভ নিশ্চিতভাবে একটি বদ ইচ্ছা যা মানুষকে পাপ ও অপমানের পথে পরিচালিত করে।"

আলী (রা) বলেছেন : "লোভ হচ্ছে খারাপ পথে পরিচালনাকারী একটি প্রেরণা।"

তিনি আরও বলেছেন : "অর্থলিপ্সার ফল হচ্ছে দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ।" (গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৩৬০)।

বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে জীবনের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে না। আত্মা কেবল দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ এবং মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও জীবনে যেমন কোন মূল্য যোগ হবে না, তেমনিই উদর পূর্তি করলেও জীবনে কোন সার্থকতা আসবে না।

এ জগতে জীবনধারণ করে মানুষ একবারই আসে, তারপর অপরিহার্যভাবে জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবন মধুরতম হতে পারে কিন্তু সময় আসলে মৃত্যুকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যে দিনগুলি অতিক্রান্ত হয় তা আর মানুষের জীবনে ফিরে আসে না। মানুষের জীবন শুধু সংক্ষিপ্ত নয়, ভীষণভাবে অনিশ্চিত। আগামীকাল আমাদের জন্য কি বয়ে আনবে সে বিষয়ে আমরা যে কেবল অজ্ঞ তাই নয়, আগামীকাল বলে কোন জিনিস আমাদের ভাগ্যে আছে কি না তাই আমরা জানি না। তাই কনগ্রেভ (Congrave) বলেন,

“Defer not till tomorrow to be wise
Tomorrow’s sun to thee may not rise.”

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান জীবনকে কোনক্রমেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেয়া উচিত নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু যেন একটি আলোর সরলরেখা, জন্মের মধ্য দিয়ে যে রেখার শুরু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অবলুপ্তি। এই ক্ষণস্থায়ী আলোর জীবনকে সৎ কাজে ব্যয় করা এবং সৎ কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাখা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “আমি তোমাদের উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি, তোমাদের কাজ হল সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।” অর্থাৎ সৎ কাজ যিনি করবেন তার পক্ষেই অন্যকে উপদেশ দেয়া সম্ভব। কিন্তু আজকাল ঘটছে তার বিপরীত। অনেক সময় আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা খুব সুন্দর করে কথা বলেন কিন্তু কাজ করেন তার বিপরীত। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ রাসূলে করীম (সা) বলেছেন - “শেষ যামানার আমার উম্মতের ঈমান রক্ষা করা এতই কঠিন হবে যেমনি আগুনের কয়লা হাতে রাখা কষ্টকর। আর তাদের কথাগুলো হবে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মত তবে কাজ হবে ফেরাউনের মত।”

আজ আমাদের সমাজের নের্তৃত্বের মধ্যে রাসূলের (সা) এই বাণীটিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাই কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন– “তোমরা এমন কথা বল না যা তোমরা নিজেরা কর না।”

মূল্যবোধের অবক্ষয়

বর্তমান সময়ে যে সকল দেশকে আমরা খুবই আধুনিক এবং উন্নত বলে জানি তারাও কিন্তু এই চরিত্রের অবক্ষয়ের কারণেই ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। যেমন মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীদের হতাশাব্যঞ্জক উক্তি ‘আমাদের গ্রহ এক স্খলনের সমুদ্র’ অর্থাৎ কম-বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোন পথ দেখা যাচ্ছে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ শতাংশ শিশু অবিবাহিত মায়ের সন্তান। বাকি ৬৯ শতাংশ শিশু বিবাহিত মায়ের সন্তান হলেও এদের মাঝে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ জন্মের অল্প দিনের মধ্যেই পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদ দেখতে পায়। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ শতাংশ শিশু বাপ মা উভয়ের যত্ন ও পরিচর্যার সুযোগ লাভ করে না। একজন সমাজতাত্ত্বিক তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "পিতৃহীন সমাজ" বলে চিহ্নিত করেছেন।

জর্জ বুশের দুই কিশোরী কন্যাসহ সেখানে ১৮ বছরের কমবয়সী তরুণ-তরুণীদের শতকরা ৩৫ ভাগ মাদকাসক্ত। কিন্তু হায়! এর বিচার কে করবে? আমেরিকার আইনজীবীদের প্রতি পাঁচজনের একজনই তো মাদকাসক্ত!

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনও এই কথাটিকে আত্ম উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাইতো তিনি আমেরিকার শিশু সম্মেলন (Child Conference)-এ বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন-"আমি যাহা বলি তোমরা তাহা কর কিন্তু আমি যাহা করি তোমরা তাহা করিও না।" কারণ তিনি তখন গোটা বিশ্বে নারী কেলেঙ্কারীজনিত অপরাধে বিপর্যস্ত ছিলেন।

এই প্রেক্ষাপটে, আমেরিকার এককালের খ্যাতিমান টিভি বিশ্লেষক জিমি সোয়াগার্ট আর্তনাদ করে বলেছেন, 'আমেরিকা! বিধাতা অবশ্যই তোমার বিচার করবেন; আর তিনি যদি তোমার বিচার না করেন, তাহলে নৈতিক অপরাধে এবং এর কলুষতায় অস্বাভাবিকভাবে লালসা চরিতার্থ করার অপরাধে তিনি আদ, সামুদ আর লুত সম্প্রদায়কে কেন ধ্বংস করে দেন; সেজন্য স্বয়ং বিধাতাকেই একদিন ক্ষমা চাইতে হবে।'

আমেরিকার দুই মহান ব্যক্তির একজন জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, 'সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলে সুনাম বাড়বে।' বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, 'আমরা যখন অপরের নিকট ভাল হই, তখন আমরা নিজেদের কাছে সর্বোত্তম।'

কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াতটি যেন সব সমস্যার সমাধান-

আজকের আধুনিক পৃথিবী একথাই প্রমাণ করছে যে-মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। এই জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দটিই

ছিল 'ইক্‌রা'। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুব সমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার পরামর্শ তিনটি – পড়, পড় এবং পড় ।

প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্তার সমন্বয়- দেহ, মন ও আত্মা। এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে এক একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, নানা সামাজিক কার্যক্রমে তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের ওপর। এ জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন : "Education is the harmonious development of body, mind & soul." দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।" কোন জাতির সন্তানকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা।

মিসরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।'

মানুষ তার বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তসারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় দামি দামি ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতি (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থবিত্তের অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য

কেবল এটা ছিল না : Education does not necessary mean marc acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. 'শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে আমরা স্কুল ও কলেজে এ কথা লিখে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তব ফল পাচ্ছি না। মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনীয় হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull এর মতে, 'If you teach your children three R's : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R':Religion, then you will get a fifth 'R': Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য: 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান (Informative knowledge) যদি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়।'

ফরাসি দার্শনিক পাস্কালকে একজন বলেছিলেন, আপনার মতো আমার মেধা থাকলে আমি আরো ভালো মানুষ হতে পারতাম। পাস্কাল জবাব দেন, আগে ভালো মানুষ হোন, তাহলে আপনি আমার মেধা পাবেন।

মহানবী (সা) বলেছেন, 'মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হল উত্তম আখলাক।' যার চরিত্র ভাল, ব্যবহার সুন্দর সে সবার প্রিয়। নবী করীম (সা) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।'

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায়ও সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিকতার প্রয়োজন বলেছেন।

আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, "Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important." তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, মানসিক বিকাশ। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, চরম সভ্যতায় উন্নীত করে, পরম আলোকে পৌঁছে দেয়।

মানব জাতির আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্তার ও মানবতার বিকাশ সাধনের জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম লগ্নে সভ্যতা ও ভদ্রতার খোলসে উদভ্রান্ত মানবজাতি মানবিক গুণাগুণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নির্লজ্জ যৌন ব্যভিচার, পরস্পর হানাহানি, শক্তিমত্ততা, বর্বরতা ও পাশবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে বড়ই অসুস্থ, বিশৃঙ্খল ও অরাজক হয়ে উঠছে। ফলে মানব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর আল্লাহ পাক ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। শিক্ষার পূর্ণতা লাভ ঘটেছে তাঁরই হাতে। তাই ইসলামী শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্গাতা।

আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, ফেকাহ প্রভৃতি জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে প্রযুক্তিগত চাহিদা-সম্পৃক্ত একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এ শিক্ষায় বিধৃত রয়েছে। এখানে কেবল আরশ আর কবরের খবরই দেয়া হয়নি; মানুষের জীবনের সমুদয় কর্মকাণ্ডের সুবিন্যস্ত সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিধান দান করা হয়েছে।

কবি মোজাম্মেল হক বলেন: শিশু বালক দেখবি যারে তারেই দিবি শিক্ষাগারে/এমন করে সমাজ তরুর ঢালবি মূলে জল/আজকে তোরা চল।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক মসজিদই আমাদের শিক্ষাগৃহ এবং প্রত্যেক খতিবই আমাদের শিক্ষক। আমরা যদি তাদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে

পারি, তবে আমাদের আর কিসের অভাব? রাসূলুল্লাহর সময় এরূপই ছিল।" আজকের জগতে বিদ্রোহী তারুণ্য কোন আদর্শের পরিচয় না পেয়ে হয়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির মত ধ্বংসকারী। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়, ক্লেদ, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা, ব্যভিচার, কুটিলতা, হানাহানি, জুলুম, নির্যাতন এবং কথা ও কাজের গরমিল সবুজ তারুণ্যকে দিশেহারা করে তুলেছে। এমতাবস্থায় বিদ্রোহী তরুণ সমাজের কাছে ইসলামের আদর্শের শিক্ষা তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আল্লামা ইকবাল বলেন : 'জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা,/ফকরের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অন্তর ও দৃষ্টির;/আত্মার অসি যখন শাণিত হয়/ ফকরের শান পাথরের,/একটি মাত্র সৈনিকের শক্তি/অর্জন করে একটি বাহিনীর।'

সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযোগ্য ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে সৃজনী শক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ ঘটানোই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে। শিক্ষা যদি জীবনে কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়, শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা : 'প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য প্রাণীর শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়।

আর এই শিক্ষার অভাবেই গোটা জাতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এটিকে আমরা বলি অপরাধ বা অবক্ষয়। এটির জন্য আইনের প্রয়োগই আমাদের সমাজের সর্বোচ্চ বিধান। জীবনের জন্য আইন তৈরি ও তার প্রয়োগ অব্যাহত কিন্তু আমাদের অপরাধ কেন যেন বেড়ে চলছে!

প্রায় সাত দশক আগে লর্ড কেইনস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা একবিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে যেন আজ বাস্তবতা:

The problem of want and poverty and the economic struggle between classes and nations is nothing but a frightful muddle, a transitory and unnecessary muddle. For the Western World already has the resource and the technique, if we could create the organization to use them, capable of reducing the Economic problem which now absorbs our moral and material energy to a position of secondary importance ...... Thus the ..... day is not far off when the economic problem will take the back seat where it belongs, and ..... the arena of the heart and head will be occupied .... by our real problem – the problems of life and human relations, of creation and behavior and religion.

(অভাব আর দারিদ্র্যের সমস্যা এবং শ্রেণী ও জাতিসমূহের মধ্যে সংঘাত একটি ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তি মাত্র। আমরা যদি যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি তবে পাশ্চাত্য জগতে যে সম্পদ ও কারিগরী জ্ঞান রয়েছে তা আজকের অর্থনৈতিক সমস্যাকে, যা আমাদের নৈতিক ও পার্থিব শক্তিকে নিবিষ্ট করে রেখেছে, গৌণ সমস্যাতে পরিণত করতে সক্ষম। তাই, সে দিন দূরে নয় যে দিন অর্থনৈতিক সমস্যা যথাস্থানে না পড়ে পেছনে পড়ে থাকবে এবং ... মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তি ...... আমাদের সমস্যা যে সব প্রকৃত সমস্যা তাদের সমাধানে নিয়োজিত হবে। সেসব সমস্যা হল ... বাঁচার সমস্যা, মানবিক সম্পর্কের সমস্যা, সৃষ্টির সমস্যা এবং আচরণ ও ধর্মের সমস্যা।

জুলাই, ২০০৮

ছাত্রসংগঠনের ৩৩ বছর

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ঐতিহাসিক অবদান

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ৪০ বছর আগে ১৯৬১ সালে তার অভিষেক ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তার অংশ not what your country can do for you, ask what you can do for your country অর্থাৎ তোমার জন্য তোমার দেশ কি করবে তা জানতে চেয়োনা বরং তোমার দেশের জন্য তুমি কি করবে সেটাই বলো।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ৩৪ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি একটি করে ৩৩ বছর পার করে দেয়া একটি ছাত্রসংগঠনের জন্য খুব সহজ ব্যাপার নয়। অবশ্য পৃথিবীর তাবৎ আন্দোলন-সংগঠনকেই বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার পাহাড় পার হতে হয়েছে। মুখোমুখি হতে হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পরিস্থিতি ও দুর্দশার । এ ধারাবাহিকতায় ইসলামী ছাত্রশিবির ব্যতিক্রমী নয়। ফেলে আসা ৩৩ বছরে নানা ঘটনা-রটনা, অপপ্রচার ও অপশক্তির নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতা উপেক্ষা করে এ সুন্দরের মিছিল আজ এক গর্বিত আঙিনায় । একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ৩৩ বছর ধরে আমাদের যে পথ অঙ্কিত হয়েছে তা শহীদি রক্তে রঞ্জিত। আহত-পঙ্গুত্ব বরণকারীদের আহাজারিতে প্রকম্পিত। এ পথ সাহসী পদভারে ও উজ্জ্বলতায় চিহ্নিত। এ পথ একটি চিরম্ময়তায় উদ্ভাসিত। সকল বিপত্তির মোকাবেলায় আমাদের দৃষ্টি সেই মঞ্জিলের দিগন্তে উচ্চকিত। আমরা সবকিছু বিনিময় করি একটি মাত্র ঠিকানার আশ্বাসে যার নাম জান্নাত।

ছাত্রশিবির একটি আদর্শিক আন্দোলন ও মেধাবী ছাত্রদের সাহসী ঠিকানার নাম। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। অন্যায়, অসত্য ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ। মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অঙ্গীকার। সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাই হতাশার গুহায় আশার আলো জ্বালিয়ে নির্ভেজাল করে আগামীর রাজপথ। ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদের সংগঠন হলেও ৩৩ বছরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রসহ দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় বহুবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ায় এক সাহসী ও উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে ছাত্রশিবির। এছাড়া ছাত্রসমাজের দাবি আদায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধান, ছাত্রদের নানান সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে শিবির সদা সচেতন ও তৎপর। বিগত ৩৩ বছরে শিবিরকে প্রতিপক্ষের অপপ্রচার মোকাবেলা করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে শিবিরকে যেমন হয়রানি ও অবদমনের অপচেষ্টা চলেছে তেমনি বারুদের নির্মমতা ব্যবহার করে শত্রুপক্ষ থামিয়ে দিতে চেয়েছে এ সাহসী পথচলা। এসবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিবির এক স্বর্ণালী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে। যে ইতিহাস প্রেরণা যোগায় ভবিষ্যতের পথ চলায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ ইসলামের জন্য বরাবরই অবারিত ও নিবেদিত। অসংখ্য মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ইসলামী ছাত্রশিবির। শহীদের পিতা-মাতা-ভাই-বোনের বিনিদ্র রজনীর চোখের পানি ও দেশবাসীর ভালবাসাই আমাদের প্রেরণা। তাই আমাদের প্রতিষ্ঠার ৩৪তম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমরা দেশবাসীকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা।

ছাত্রশিবির একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এমন এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে একজন শিক্ষার্থী তার মেধা, মনন ও প্রতিভা বিকাশের যাবতীয় উপকরণ পেয়ে থাকে। যে সব উপায়-উপাদান ও বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলা যায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে সে সব শিক্ষার উপায়-উপাদান ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান। শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য - Hermonius Development of Body, Mind and Soul – এ সবগুলো শর্তই শিবিরের কর্মসূচি, পরিকল্পনা কার্যক্রমে বিদ্যমান। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৫ দফা কর্মসূচির মধ্যে ৪র্থ দফা কর্মসূচিই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমস্যা সংক্রান্ত। দফাটি হচ্ছে : আদর্শ নাগরিক তৈরির উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিতে সংগ্রাম ও ছাত্রসমাজের প্রকৃত সমস্যার সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা। বর্তমান সময়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের মাধ্যমে একথা খুব পরিষ্কার যে, জাতিকে এর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ ঘটানোর কোন বিকল্প নেই।

এছাড়াও শিবিরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সিলেবাস, নিয়মিত পাঠচক্র, সামষ্টিক পাঠ, স্টাডি সার্কেল, স্টাডি ক্লাস, নিয়মিত অধ্যয়ন, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা, শরীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশে রক্ষা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও লাইব্রেরির ব্যবস্থা। এক কথায় নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে ইসলামী ছাত্রশিবির ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঐতিহাসিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১. সৃষ্টি-স্রষ্টা সম্পর্ক অধিকার ও দায়িত্ব সচেতনঃ মানুষ একটি নৈতিক জীব। তাই মানুষের মধ্যে রয়েছে দুটি সত্তা। একটি পাশবিক সত্তা বা দেহ। দ্বিতীয়টি নৈতিক সত্তা বা বিবেক। বিবেক যদি দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে দেহ শুধু ভাল কাজই করে। আর যে ভাল কাজ করে এবং মন্দ থেকে বিরত থাকে তাকে সৎ এবং চরিত্রবান বলা হয়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক, স্রষ্টার অধিকার ও সৃষ্টির কর্তব্যজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হয়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক জানার সুযোগ নেই। অন্যদিকে ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

২. মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ঃ একটি সমন্বিত সিলেবাস পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে নৈতিক মনোন্নয়ন ও মূল্যবোধ বিকাশের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মানবিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ নেই। অন্যদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেবাস অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত শিক্ষা লাভের পাশাপাশি তার নৈতিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশ করতে সক্ষম হয়। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্যসেন তার দীর্ঘ গবেষণায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অগ্রগতির সাথে সমান্তরালভাবে Ethics-কে গুরুত্ব দেয়ার কথা তুলে ধরেছেন। ফরাসি দার্শনিক পাস্কালকে একজন বলেছিলেন, আপনার মতো আমার মেধা থাকলে আমি আরো ভালো মানুষ হতে পারতাম। পাস্কাল জবাব দেন, আগে ভালো মানুষ হোন, তাহলে আপনি আমার মেধা পাবেন।

নবী করীম (সা) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।'

গ্রিক দার্শনিক পেটো, এ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায়ও সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিকতার প্রয়োজন বলেছেন। বস্তুবাদী শিক্ষার

অন্যতম দার্শনিক স্ট্যানলি হল বলেন, 'If you teach your children the three R's (Reading, Writing and Arithmatics) And leave the fourth 'R' (Religion), you will get fifth 'R' (Rascality).'

৩. দেশাত্মবোধ : এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীরা চরিত্রহীনতা, হীনম্মন্যতা, সন্ত্রাস আর সর্বনাশা নেশার নীল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর শিকারে পরিণত হচ্ছে এবং জাতিগতভাবে আমাদের অবস্থান উল্কার গতিতে হচ্ছে পশ্চাৎগামী। বুক ফেটে আর্তনাদ আকারে এ পরিণতির কারণ হিসেবে একটি উত্তর বেরিয়ে আসে আর তা হচ্ছে 'ঐতিহ্যের বিচ্যুতি ও দেশপ্রেমের অভাব।' জাগৃতির কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কণ্ঠে ঝংকৃত ভাষায় এর উত্তর হতে পারে এমনটি-

"দেখ একবার ইতিহাস খুলি
কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি,
তথা হতে হায়! কেন রে পড়িলি?
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার।"

আমাদের দেশ সত্যিই একদিন সোনার বাংলা ছিল। যার সম্পর্কে মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা ১৩৪০ সালে বাংলাদেশ সফর করে এ দেশকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী ও সস্তা জীবনোপকরণের দেশ' বলে তার সফরনামায় উল্লেখ করেন (সফরনামা- পৃঃ ১৩০-১৩২)। ১৫১৪ সালে চীনা রাজকীয় প্রতিনিধিরা বলেছেন, 'সপ্ত স্বর্গ এই রাজ্যে পৃথিবীর স্বর্ণরাজি ছড়িয়ে রেখেছে।' ১৬৪০ সালে আগত পর্যটক বিস্তিয়ান মানরিক বলেন, বাংলায় তখন এত সম্পদের ছড়াছড়ি ছিল যে, বিত্তবান ববসায়ীদের অনেকে ধামা বা ঝুড়ি ভর্তি করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা মেপে হিসাব করতেন (মানরিকের বিবরণ-১৮)। ১৬৬৬ সালে এ এলাকা সফর করে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার লিখেন, 'বাংলা মুলুক হিন্দুস্থানের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী অঞ্চল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ (বার্নিয়ার-১৬৯)। তাই আমাদের আরো সচেতন হতে হবে এবং হতে হবে প্রচণ্ড রকম দেশপ্রেমিক।

৪. সততা ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন: ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে শিবির এই দৃষ্টান্ত স্থাপনে চমৎকার সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। বিগত সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী তৎপরতা চালাতে গিয়ে ছাত্রশিবির যে নিষ্ঠা ও সততার নজির স্থাপন করেছে তা জাতির বিবেকবান মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। আদর্শিক মোটিভেশনই যে এর প্রধান কারণ অনেকেই তা উপলব্ধি করেছেন এবং এর স্বীকৃতি দিচ্ছেনও। এছাড়াও বিগত দিনে সরকারের অংশীদারিত্ব থাকলেও শিবিরের বিরুদ্ধে Power Politics এর কোন অভিযোগ নেই।

৫. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন : ইসলামী ছাত্রশিবিরের জনশক্তিদের প্রতিদিন ব্যক্তিগত রিপোর্ট লিখতে হয়। ব্যক্তিগত Report-এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকে জ্ঞান ও আমলের দিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উপযোগী করা, নৈতিক ও আত্মিক দিকসহ সকল দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে Report-এর ব্যবস্থা আছে তা আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ছাত্রসংগঠনে নেই। ইদানিং কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে ব্যক্তিগত ডায়েরি লেখার ব্যবস্থা থাকলেও তা ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি থেকে অনুসৃত। এছাড়াও শিবিরের প্রতিটি ইউনিট প্রতিমাসে তাদের মাসিক কাজের Report তৈরি করে থাকে। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজের Report পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের জন্য ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। রাসূল (সা) বলেছেন, 'যার আজকের দিন গতকালকের চেয়ে উন্নত হল না সে অভিশপ্ত।'

৬. ছাত্রকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কাজঃ ইসলামী ছাত্রশিবির সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সংকট ও দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ বিতরণ, উদ্ধারকাজ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বাধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, সবার জন্য শিক্ষা, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ, পথশিশুদের আশ্রয়দান, রক্তদান ও বাড গ্রুপিংসহ নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিবির সাধারণ ছাত্রজনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সমাজ সচেতন করে গড়ে তোলা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিবির সে কাজটি প্রতিনিয়তই করে থাকে। অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংগঠনের এ ধরনের উদ্যোগ খুবই গৌণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসমাজের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণের দাবিতে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে বহু কর্মসূচি পালন ও ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ছাত্রশিবির যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে সেখানেই আরো বেশি ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। ৮০-র দশকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য

সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এককভাবে শিবিরের প্যানেল বিজয়ী হয়। এতে বাতিলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে; শিবিরের উপর জুলুম নির্যাতন বেড়ে যায়। শিবিরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তারা প্যানেল দেয়। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐকব্যবদ্ধ প্যানেলে বিরুদ্ধে এককভাবে শিবির বিজয়ী হয়। ছাত্রদের কল্যাণমুখী কার্মকাণ্ড পরিচালনায় শিবির তৎপর।

৭. ছাত্রআন্দোলনে গঠনমূলক কর্মসূচি প্রবর্তন : ইসলামী ছাত্রশিবির গঠনমূলক কর্মসূচি নিয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে আবেদনের সৃষ্টি করেছে। আত্মগঠন, চরিত্র গঠন, পড়ালেখায় যত্নবান হওয়া, ইসলামী আদর্শের অনুশীলন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে শিবিরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজদের প্রতি সাধারণ ছাত্রসমাজের অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা হ্রাস পাওয়ার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

৮. বিজ্ঞানভিত্তিক পাঁচ দফা কর্মসূচি : আমাদের কর্মপদ্ধতি রচিত হয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ও যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পানে ধাবিত হওয়ার একটি নিরেট পথ তৈরি করার জন্য।

৯. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কাঙ্ক্ষিত মানের হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেই প্রত্যাশিত কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিস্বার্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নীতিবোধহীন অস্বস্থিকর এক সম্পর্কের ভিতরে ছাত্ররা আজ শিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে তারা মৌলিক কিছুই শিখাতে পারছে না। এজন্যই ধানমণ্ডি গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে এক শিক্ষককে তারই দু'ছাত্র গুলি করে হত্যা করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির এ ধরনের অপরাধপ্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

১০. শিক্ষানীতির জন্য আন্দোলন : শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৩৮ বছর পরও বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে দেশে কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শিবির বরাবরই এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে জনমত সংগ্রহের জন্য জাতীয়

শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন, স্থানীয় সেমিনার সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক, বুকলেট প্রকাশ, পুস্তিকা প্রকাশ, শিক্ষা স্মরণিকা প্রকাশ ও Workshop, গ্রুপ মিটিং ইত্যাদি কমসূচি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে ১৫ আগস্টকে "ইসলামী শিক্ষা দিবস" হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ২০০২ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান মেলা, জাতীয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর, শিক্ষা সামগ্রী প্রদর্শন, Understanding Science Series প্রদর্শনী এবং "আমাদের শিক্ষা সংকট : উত্তরণের উপায়" শীর্ষক বুকলেট প্রকাশসহ বহুবিধ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে শিবিরে অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপরে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং বই লেখনীর কাজ করেছেন। শিবিরের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি শিক্ষা স্মারক বের হয়েছে। শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

১১. সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন : শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি রয়েছে শিবিরের। সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে তোলার জন্য শিবিরের অত্যন্ত প্রিয় শোগান হচ্ছে "মানুষ গড়ার আঙ্গিনায়, মানুষ হবার পরিবেশ চাই।"

১২. দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার এক অপূর্ব সমন্বয় : ইসলামী ছাত্রশিবির সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় বা মাদ্রাসা শিক্ষায় গড়ে ওঠা "মিস্টার আর মোল-াদের" মধ্যে সৃষ্টি করেছে সুন্দর সমন্বয়। শিবিরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের এক চমৎকার সমন্বয় এবং ঐক্য গড়ে উঠেছে। শিবিরের বদৌলতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ইসলামী জ্ঞানে। আবার মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা সুযোগ পেয়েছে আধুনিক বিষয়ে শিক্ষা লাভের। অর্থাৎ শিবির আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান ইসলাম শিক্ষার এক যুগোপযোগী সমন্বয় ঘটিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে চিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৩. নকল প্রবণতা থেকে মুক্ত : ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদেরকে নকল প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। শিবিরের সাথী ও সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছাত্ররা নকল করতে পারে না। কেউ নকল করলে তার সাথী বা সদস্য পদ বাতিল করা হয়। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিলেও শিবির তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্যকোন ছাত্রসংগঠনে তা কল্পনা করা যায় না।

১৪. লেন্ডিং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা : শিবির তার কর্মীদেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই তার বই শিবির পরিচালিত লেন্ডিং লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে প্রদান করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও শিবির বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্লাসের বই লেন্ডিং লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে থাকে। ফেরত দেয়ার শর্তে তা গরিব ও উপযুক্ত ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

১৫. ছাত্র সংসদ নির্বাচন : একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন প্রতিযোগিতা থেকে শিবির পিছিয়ে থাকতে পারে না। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের মূল কাজের পরিমাণ যাচাই করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণই আমাদের কাজ নয়, নির্বাচনের আগেও আমাদেরকে মৌলিক বা বুনিয়াদি কাজ করতে হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমতি নিতে হয় এবং প্যানেলে কে কোন পদে নির্বাচন করবে সেটাও কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্ধারণ করে থাকেন। তারা নিজেদের মূল কাজ বাদ রেখে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না।

১৬. স্পিকার্স ফোরাম : ছাত্রশিবির মেধাবী ছাত্রদের যোগ্যতার বিকাশে এবং সুপ্ত প্রতিভার পরিস্ফুটনের জন্য স্পিকার্স ফোরামের মাধ্যমে ভাল বক্তা হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ডিবেট সোসাইটি গঠন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

১৭. লেখকশিবির : যুব সমাজের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে ও সাহিত্যমোদি ছাত্রদেরকে সংগঠিত করে লেখক শিবির গঠন করা হয়। সাহিত্য আসর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাময়িকী, দেয়ালিকা, পত্রিকা, স্মরণিকা ও সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে লেখার যোগ্যতা বৃদ্ধিতে শিবিরের কর্মসূচি রয়েছে।

১৮. I.T-তে শিবির : শিবির তার জনশক্তিকে I.T সচেতন করার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে। শিবিরের Website www.shibir.org.bd

কুরআনে নামাজের কথা বলা হয়েছে ৮২ বার অথচ জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে ৯২ বার। আল কুরআনে ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে অন্তত ৭৫০টি আয়াত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক।

১২৫০ সালে স্পেনের টলেডোতে আজকের সভ্য ইউরোপের শিক্ষক মুসলমানেরা প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র School of Oriental Studies স্থাপন করেন। কর্ডোভাতে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানরা স্থাপন করেন। যেখানে সব সময় ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ১০ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো। এ ব্যাপারে যোশেফহেলের মন্তব্য হলো: Cordova shone like lighthouse on the darkness of Europe. আমরা সেই সময়ের কথা বলছি যখন ইউরোপে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটি ছিল রানী ইসাবেলার অধীনে, যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০১টি। অপরদিকে তৎকালীন ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়াতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিল ১০ লক্ষ বই।

১৯. লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট : সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তৈরির জন্য এবং কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য লিডারশীপ ট্রেনিং ক্যাম্প, ১০ দিনব্যাপী শিক্ষা শিবিরসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

২০. সৃজনশীল প্রকাশনায় শিবির : ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। আধুনিক রুচিসম্মত এবং সমাজিক চাহিদানির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী এই বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়। তথ্যবহুল দাওয়াতী কার্যক্রম উপহার আদান প্রদান এবং সুস্থ বিনোদন চর্চায় শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী অনন্য। এই প্রকাশনা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে নববর্ষের ৬ প্রকার ক্যালেন্ডার, ৪ প্রকার ডায়েরি, অসংখ্য ক্যাসেট এবং বহু রকমের কার্ড, ভিউকার্ড, স্টিকার, মনোগ্রাম, কোটপিন, চাবির রিং, চিঠির প্যাড ইত্যাদি। এইসব প্রকাশনির মাধ্যমে শিবির ছাত্রআন্দোলনের মাঝে একটি বিপব সৃষ্টি করেছে। শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী সর্বস্তরের মানুষের কাছে একটি অপরিহার্য সৌন্দর্যের প্রতীক। তথ্যবহুল, গবেষণালব্ধ, বহু রং ও ডিজাইনের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি দেশ ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মনোরমা সমসাময়িক প্রচ্ছদ নিয়ে মাসিক ছাত্রসংবাদ, Perspective, ত্রৈমাসিক- At a Glance বের হয়, যা ইতিমধ্যেই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

২১. বিজ্ঞানসামগ্রী প্রকাশনা : দেশের শিক্ষার পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশ করেছে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যার উপর রেফারেন্স বই ও চার্ট পেপার । এই বইগুলো এস.এস.সি/দাখিল, এইচ.এস.সি/ আলিম ও ডিগ্রীর প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনন্য ও অপরিহার্য শিক্ষা সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । বহুরঙ্গা ও দ্বিমাত্রিক চিত্রসহ সম্পূর্ণ ডি.টি.পিতে ও ইলাস্ট্রেটেড ডিজাইনে ছাপানো এ উচ্চমানের বইগুলো বাংলা ভাষায় ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি । ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ, প্রয়োজন এবং একাডেমিক শিক্ষার যথার্থ তথ্য উপকরণ দিয়েই এই Understanding Science Series প্রকাশিত হয়েছে ।

২২. সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে : একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব । এ দেশের ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে শিবিরের রয়েছে নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার । জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের পাশাপাশি একজন ছাত্রকে মানসিক বিকাশের জন্য এবং তার মধ্যে সহজভাবে ইসলামের জীবন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য রয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা । অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে ছাত্র ও যুবসমাজকে রক্ষা করে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হলেও প্রয়োজন পরিশীলিত সংস্কৃতির আয়োজন । সাহিত্য সংস্কৃতি মানেই অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, পাশ্চাত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ অনুকরণ, এই ধারণার পরিবর্তন করতে শিবির বদ্ধপরিকর । ইসলামী ছাত্রশিবির সে জন্যই ইসলামী সংস্কৃতির এক বিরাট জগতকে গড়ে তুলেছে । বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় তার সবটুকু শিবিরেরই প্রচেষ্টার ফসল । ইসলামী সংস্কৃতির ধারা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । গান, কবিতা, নাটক রচনা ও সংকলন এবং ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকে ।

২৩. দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ : জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সময়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জনশক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে । রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন পেশার এবং চিকিৎসা ও সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক একদল দক্ষ লোক তৈরিতে শিবির অবদান রেখেছে । এসব ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সততা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন । এদের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলেও এসব ব্যক্তিরা সমাজে সৎ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন । উচ্চশিক্ষিত পর্যায়ে সৎ মানুষের অভাব যে দেশে সে দেশে কিছু সৎ মানুষ উপহার দিতে পারাটা কম কথা

নয়। সমাজদেহে আজ যে দুর্নীতি তার উৎস সাধারণ নিরক্ষর মানুষগুলো নয়। উপরের স্তরে দুর্নীতি আছে বলেই দুর্নীতি এক সর্বগ্রাসী রোগ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২৪. অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক পরিবেশ : শিবিরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ জান্নাতি পরিবেশ। এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্ত্রের ঝনঝনানী, সন্ত্রাস, ছিনতাই, সংঘাত, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনার সয়লাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছাত্রসমাজ। ফেনসিডিল, হেরোইন ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রকে নির্দ্বিধায় আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করে না। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও উৎসাহ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, শুভাকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসা। তদুপরি নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য ত্যাগী মনোভাব ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক পরিবেশকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে।

২৫. নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক : ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে নেতার পিছনে পিছনে ছুটা, চাটুকারিতা, গ্রুপিং-লবিং আর অভ্যন্তরীণ সংঘাত আজ ছাত্ররাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবির তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে নেতা ও কর্মীদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক। নেতার সাথে নেতা, কর্মীর সাথে কর্মীর সম্পর্কও ঈর্ষণীয়। ইসলামী আন্দোলনে নেতার আদেশ ও কর্মীর হক আদায় এবং মর্যাদা দানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২৬. অনন্য নির্বাচন পদ্ধতি : ছাত্রশিবিরের রয়েছে এক ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচন পদ্ধতি। এখানে কোন প্রার্থী থাকে না; সবাই ভোটার সবাই প্রার্থী। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে গ্রুপ সৃষ্টি করা যায় না। কারো জন্য ভোট চাওয়া যায় না। নিজেকে ভোট দেয়া যায় না, নিজের জন্য চাওয়াও যায় না। এ ধরনের অনন্য নির্বাচন পদ্ধতি অন্য কোন সংগঠনে কল্পনাও করা যায় না। রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া যায় না।

২৭. ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান : আমাদের সংবিধানে ৫০টি ধারা, তিনটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট আছে। এটি উপধারা বিবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ, সহজ-সরল, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়ের সমন্বয়। এ সংবিধানে ক্ষমতার একটি সুন্দর

ভারসাম্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সাথে পরমার্শ করে কাজ করবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার সকল কাজের জন্য কার্যকরী পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। এখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রয়েছে।

২৮. নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য : নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য ইসলামী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এটি ইসলামী ছাত্রশিবির অনুসরণ করে থাকে। অন্ধ আনুগত্য নয় বরং সৎ কর্মের ক্ষেত্রে আনুগত্য। ব্যক্তির পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন এখানে হয় না। নেতৃত্বের ও জনশক্তির প্রতি কর্মীদের রহম দিল ভালবাসা বিরাজিত থাকবে। নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমম্বয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের রয়েছে। এ ধরনের চমৎকার সমম্বয় আর কোন ছাত্রসংগঠনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি শিবিরের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

২৯. পদের প্রতি লোভহীনতা : ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন কাজের যোগ্য বলে মনে করলে সে ঐ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি অযোগ্য। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে তার মধ্যে (ধারা ৩২) বলা হয়েছে "পদের প্রতি লোভহীনতাকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।" অন্যদের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ঐ পদের জন্য যোগ্য প্রমাণিত করার জন্য প্রতিযোগিতা চলে। ফলে সৃষ্টি হয় গ্রুপিং এবং তা থেকেই সন্ত্রাস, হানাহানি ও রক্তপাত ঘটে এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হয় কলুষিত।

৩০. গঠনমূলক সমালোচনা : প্রচলিত রাজনীতিতে অনেকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলতে ভয় পায়, না জানি তিনি কিভাবে নিবেন। কিন্তু ইসলাম গঠনমূলক সমালোচনাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। এক সাথে কাজ করতে ভুল-ত্রুটি হতে পারে, এজন্য একে অপরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করা যায়। নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে যার ত্রুটি তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধরিয়ে দিতে একাধিক বার চেষ্টা করার পর সংশোধন না হলে অত্যন্ত দরদভরা মন নিয়ে বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন নয় বরং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য। সংশিষ্ট ব্যক্তিও এটা সহজভাবে গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। অন্যকোন সংগঠন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নাই।

৩১. জবাবদিহিতা : আমাদের সংগঠনে প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনা থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দায়িত্ব

পালনে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা আছে। সংগঠনের জনশক্তি, সম্পদ, সংগঠনের মর্যাদা ইত্যাদি আমানত। সে আমানতের খেয়ানত যেন না হয় সে জন্য দায়িত্বশীলগণও জবাবদিহির চেতনা নিয়েই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উমর ফারুক (রা) এর লম্বা জামা দেখে খুতবারত অবস্থায় সাহাবীরা তাকে কিভাবে লম্বা জামা পেলেন তার উত্তর দেয়ার পর বাকি খুতবা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৩২. চেইন অব লিডারশিপ : যে কোন সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতার জন্য Chain of leadership অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মলগ্ন থেকেই শিবির এ ক্ষেত্রে যথাযথ নজর দিয়ে আসছে। প্রতিবছরই নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন, সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন, কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচন, সদস্য-সাথী শাখার নির্বাচন ও জেলা সভাপতিদের মনোনয়নের কোন নজীর অন্যকোন ছাত্রসংগঠনের নেই। এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিটগুলোতেও এসময় প্রতি বছর কমিটি গঠন হয়ে থাকে। এ বিষয়গুলো অন্যান্য ছাত্রসংগঠন কল্পনাও করতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও ইসলামী ছাত্রশিবির অনন্য।

৩৩. পরামর্শ পদ্ধতি : শিবিরের প্রতিটি সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কর্মীদেরও পরামর্শ আহবান করা হয় প্রতি বছর। এছাড়া সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত গৃহীত হয়। ইসলাম পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পরামর্শের অনুপস্থিতি একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের জন্ম দেয়। ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে উপস্থিত সকলেই নিজের সিদ্ধান্ত বলে মনে করে এবং তা বাস্তবায়ন সহজ হয়; ভুল হলেও আল্লাহ মাফ করে দেন। এখানে পরামর্শ প্রদানেরও একটি সুন্দর পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। যিনি পরামর্শ দেন তার পরামর্শ গ্রহণ করতেই হবে এ ধরনের কথা নেই। শিবিরের এ ঐতিহ্য শিবিরকে আরো বেশি সুষমামণ্ডিত করেছে।

৩৪. লেজুড়বৃত্তিতা নেই : ছাত্রশিবির কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে না। আজকের ছাত্ররাজনীতিতে সন্ত্রাসের জন্য লেজুড়বৃত্তিকে দায়ী করা হয়ে থাকে। শিবিরের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকরী পরিষদ গ্রহণ করে। সেক্রেটারিয়েট সংগঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিকল্পনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত

বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতা নির্বাচন বা কমিটি গঠন Parents organization-এর প্রধানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু শিবিরের নেতা নির্বাচন বা কমিটি গঠন সদস্য ভাইদের প্রত্যক্ষ ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন আছে। নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণায় তারা ভূমিকা রাখেন।

৩৫. আত্মসমালোচনাঃ আমাদের এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ছাত্র প্রতিদিনই নিজেই নিজের সমালোচনা করে থাকে। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। প্রতিদিনের ত্রুটির জন্য সে আল্লাহর কাছে তওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরবর্তী দিনগুলো যেন আরো সুন্দর হয় এজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে সে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিশুদ্ধ করে।

৩৬. ত্যাগ ও কুরবানির এক অনুপম নজরানা : শিবির ত্যাগ ও কুরবানির এক অনুপম নজরানা পেশ করছে। ত্যাগ ও কুরবানির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন- "তোমরা কি এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা যে কারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, আর কারা ধৈর্যধারণ করেছে?" তাইতো শিবিরকর্মীরা জেলখানার নির্যাতনকে স্বীকার করেও বলতে পারে "এটা আমাদের আর একটি আবাসিক হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আমাদের যেমন থাকতে হয় তেমনি জেলখানায়ও আমাদের কিছুদিন থাকতে হবে তাতে অসুবিধা কোথায়?" শিবিরের নেতা-কর্মীদের উপর যখন জুলুম-নির্যাতন চালানো হয় তখন তারা বলতে শিখেছে- "নির্যাতন সহ্য করা আমার নবীর সুন্নাত"। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর যে জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়েছে তা যদি অন্য কোন সংগঠনের উপর চালানো হতো তবে সেই সংগঠনকে খুঁজে পাওয়া যেত না। জুলুম-নির্যাতন-নিষ্পেষণ, হত্যা শিবিরকে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে। বিগত ৩৩ বছরে শিবিরের ১৩৩ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এই শহীদদের সকলেই ছিলেন মেধাবী এবং সৎ চরিত্রবান। তাদের সহপাঠীগণ ও শিক্ষকবৃন্দ এর স্বাক্ষী। তাদের অপরাধ ছিল একটাই তারা ইসলামের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

৩৭. জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় ইস্যুতে ভারসাম্যমূলক ভূমিকা : শিবির কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন নয়। তবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে শিবির গঠনমুখী এক দৃঢ় ভূমিকা পালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাজনীতিতে যেমন গা ভাসিয়ে দেয়নি শিবির কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে একাকার হয়ে যায়নি আবার সচেতন শিক্ষার্থী হিসাবে জাতীয় রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়েও রাখেনি। জাতীয় রাজনীতির ডাকে এ কারণেই সময়োচিত সাড়া দিয়ে সঠিক ভূমিকাই পালন করেছে শিবির। ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাপার কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আন্দোলন, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের আন্দোলন, '৯৬ থেকে ২০০১ আওয়ামী দুঃশাসনবিরোধী আন্দোলন, দেশের প্রতিটি নির্বাচনকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে শিবির অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলনকে গতিশীল করে আওয়ামী দুঃশাসন অবসানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাছাড়াও ছাত্রসংগঠনসমূহের মধ্যে একটি চমৎকার সুসম্পর্ক ও সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টিতে শিবির অবদান রেখেছে। ২৮ অক্টোবর'০৬ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঐতিহাসিক ভূমিকা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩৮. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তৈরিতে শিবির : বিশ্বমুসলিম যুব সংস্থা (ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়োথ), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন এর সদস্য হিসাবে আন্তর্জাতিক ময়দানে শিবিরের সরব ভূমিকা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আসুন নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬

PPBN : 042
9843114260